# আমাদের স্বাধীন কলম

শারদ সংখ্যা || ১৪২৭

©SAGNIK

# রত্নরাজি

কবিতা:-

১. বিদায় বেলার ভৈরবী: অর্পণ ঘোষ
২. শব্দদের মিছিল: প্রমথেশ ভুঞ্যা
৩. রাষ্ট্রীয় শোক: নির্বেদ
৪. চেয়ে দেখি: ঋভুব্রত পাল
৫. টান: প্রজ্ঞা
৬. দ্বন্দ্ব: শিবতোষ মৃধা
৭. তৃণসমূহ: কুসুম
৮. আমি ও পৃথিবী কখনো দেখা করিনি: সমন্বয়
৯. লিমেরিক: স্মৃতি বেগ বিশ্বাস
১০. উপলব্ধি: স্মৃতি বেগ বিশ্বাস
১১. গন্ধ: অনির্বাণ মান্না
১২. শুরু হবে রোদের জন্মদিন: মৌসুমী সেন চক্রবর্তী
১৩. ভীষন দামী: সৃজা সর্দার
১৪. সেই গল্পে: সৃজা সর্দার
১৫. কাঁদবে তুমি সেদিন রে: দীপঙ্কর ঘোষ
১৬. কল্পতরু: প্রীতম দাস
১৭. এই জীবনে: সোহান ঘোষ
১৮. অদ্ভুত আঁধার: মহুয়া চক্রবর্তী
১৯. ধ্বংস: প্রতীক মন্ডল
২০.অনুসূয়া : নির্বেদ

গল্প:-
১. মিনি-বেড়াল: কৌশিকী ভট্টাচার্য্য
২. মুক্তি: হিন্দোল সরকার
৩. আইরিশ মেয়েটির জন্য: আহেলী দে
৪. অন্য পৃথিবী: নির্মাল্য সেনগুপ্ত
৫. আগমনী: বিপাশা দাস
৬. অনাঘ্রাত: অরিত্র দত্ত

ভ্রমণকাহিনী:
১. সেবকের পথে: রীতা ঘোষাল

প্রবন্ধ:
১. উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রধান অভিমুখ: আকাশ মুখার্জী
২. ৩ নং হিথ ভিলা, হ্যামস্টেড: দেবার্ঘ্য চক্রবর্তী
৩. একাদশের একাদশ: সায়ক চক্রবর্তী
৪. আড়াই বছর প্রাক্তনী: সায়নদীপ মন্ডল
৫: ককেশাসের কেলেঙ্কারি:শুভম সরকার

ছবি:-
১. A Slow Stream Of Raugh Sketches: সৌরভ সরকার
২. Series: untitled: সৌরিন দাস
৩. বসুন্ধরা হালদার
৪. স্বাগত দাস
৫. নৈরিক
৬. দেবস্মিতা সেনগুপ্ত
৭. নিলোফার আলি শা
৮. অঙ্কিতা আলী
৯. প্রাঞ্জল রায়
১০.পায়েল দাস
১১.দীপতাংশু পাল [childrens' corner]

চিত্রবিচিত্র:-
১. রঙ: দীপ শেখর চক্রবর্তী
২. সেবন্তী ভট্টাচার্য
৩. অনিন্দিতা মৃধা

অডিও ভিজ্যুয়াল:-
১. খরস্রোতা
২. প্রণব কুমার কর
৩. আগমনী মন্ডল
৪. দীপ নন্দী
৫. কনিকা সরকার
৬. সায়ক চক্রবর্তী
৭. পার্থপ্রতিম রায়
৮. অরিত্র পান্ডা
৯. শিপ্রা অধিকারী

৯. সৃজিতা চক্রবর্তী
১০. প্রীতম দাস
১১. সুশোভনা ঘোষ
১২. সুমন মৈত্র
১৩. চয়নিকা মন্ডল
১৪. সৃজিতা দাস
১৫. সুরঞ্জনা দেবনাথ
১৬. অরুনিমা চৌধুরী
১৭. জেবা নাসরিন
১৮. এঞ্জন চক্রবর্তী

চিত্রগ্রহণ

১. সহস্রাব্দী ব্যানার্জী
২. রূপম মাল
৩. অহনা বেরা
৪. এঞ্জন চক্রবর্তী
৫. মেঘ যদি রোজ বৃষ্টি কাঁদে
তোমায় আমায় কাঁদায় কিসে:
শুভব্রত সামন্ত

The price for this magazine has been set to be 30/- . All of this purchase money collected along with any donations will be forwarded to Kodalia Netaji Scout And Guide Group a charity organisation that has worked relentlessly to extend their helping hand to millions of people.

Their upcoming project is to set reflective collars around full grown street dogs in Kolkata to prevent them from being run over by cars. Also with our kind help from the readers they will continue to flourish and spread the love.

With association:

All copyrights reserved under:
Amader Swadhin Kolom ©
Price: 30/- only

# রঙ

## ...দীপ শেখর চক্রবর্তী

মোম রঙের বাক্সটা কিছুদিন পুরোনো হওয়ার পর দেখি কালোরংটা সবার আগে ফুরিয়ে গেছে। সাদা রং অনেকটা ব্যবহার হলেও তার থেকে আগে ফুরোয় নীল। বাকি রঙগুলো অল্প অল্প খরচ হয় তবে দিব্যি রঙিন হয়ে ওঠে জীবনের ছবিটা। তবে এত কালো কোথায় যায়? দেখি ছবির মধ্যে একেকটা আকৃতি কালো দিয়ে কেমন ঘিরে দিয়েছি।এক একটা আকৃতি । কখনও মানুষ , কখনও প্রকৃতি , কখনও আঘাত , কখনও আনন্দ , এমনকি অভিমান।সীমারেখা বেঁধে দিচ্ছি কালো দিয়ে।ভেতরে ঘষে চলেছি রঙিন।তবু স্পষ্ট হচ্ছে না কালো।স্পষ্ট করে তুলছে।কালো রঙের মোম ফুরিয়ে যাচ্ছে সবথেকে বেশি । মাঝে মাঝে এই জীবনকে খুব অবিশ্বাস হয়।এত ভালোবাসলাম , এত ঘৃণা করলাম , এত বিশ্বাস করলাম , এত রাগ করলাম অথবা অভিমান কিছুই কি কোথাও পৌঁছয় ? একটা মাঝারি মাপের নীল গ্রহে প্রাণীজগতের মধ্যে মাঝারি আয়ু নিয়ে আমরা এতকিছু করে চলেছি।এসবের কিছুর কোন মানে আছে কী ? সাফল্য অথবা না পাওয়া সাফল্যলাভ অথবা ক্ষতি , আলোয় থাকা অথবা অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া কিছুই কি কোথাও থাকে ? শুধু শুধু প্রাণের এতসব অশান্তি।শুধু কিছুটা সময় বেঁচে থাকা।কিছুই কি পাওয়া নয় ? বাইরে প্রবল বৃষ্টির মাঝে ঘরে বসে বসে কালো মোম রং দিয়ে আরও গাঢ় করে তুলি আকারগুলো ।কিছুই কি পাওয়া যায় ? একটা মাঝারি মাপের গ্রহে মাঝারি আয়ু নিয়ে শুধুই জয় ও পরাজয় ? জয়ের পর অসীম শুন্যতা কিছু নয় ? পরাজয়ের পর নতুন করে জীবনকে পাওয়া কিছু নয় ? শুধুই অবিশ্বাস ? কাউকে বিশ্বাস করার পরবর্তী আশা নয় ? শুধুই বিচ্ছেদ ? বিচ্ছেদ বেদনার ভেতরেও তাকে পাওয়ার আনন্দটুকু নয় ? সমস্ত ছবি রং করাই একদিন ফুরিয়ে যায়। কালো রঙের বিভিন্ন আকৃতির ভেতরে নানারঙের মোম ঘষি।ধীরে ধীরে সাদাকালো থেকে রঙিন হয়।চোখে ভরাট লাগে।সেই ছবি পুরস্কার পেলো নাকি তিরস্কার কিই বা যায় আসে । একটা ছবি হয় উঠছে , চোখের সামনে , প্রাণের ভেতরেও । কালো রং সবথেকে বেশি ফুরিয়ে যায়।সাদা রং বেশি ব্যবহার হলেও বেশি আগে ফুরোয় নীল।নীল স্বপ্নের রং।সবথেকে বেশি স্বপ্ন দেখে মানুষ।সে তো সুন্দর । তবু কালো রং খুব প্রয়োজন। অবিশ্বাস , বিষাদ , আঘাত , অপমান এতসব কালো রং জীবনে বেশি লাগেফুরিয়ে যায় তাই সবথেকে বেশি । জীবনের রঙিন

ছবির ভেতরে দেখাই যায় না।তবু খুব প্রয়োজন ছবিটা সম্পূর্ণ করার জন্য খুব প্রয়োজন বাকি রংগুলোর ভেতর একটা স্পষ্ট আকার দেওয়ার জন্য । ছবি হয় , একটা রঙিন ছবি ঠিক এভাবে আঁকা হয়ে যেতে থাকে ...

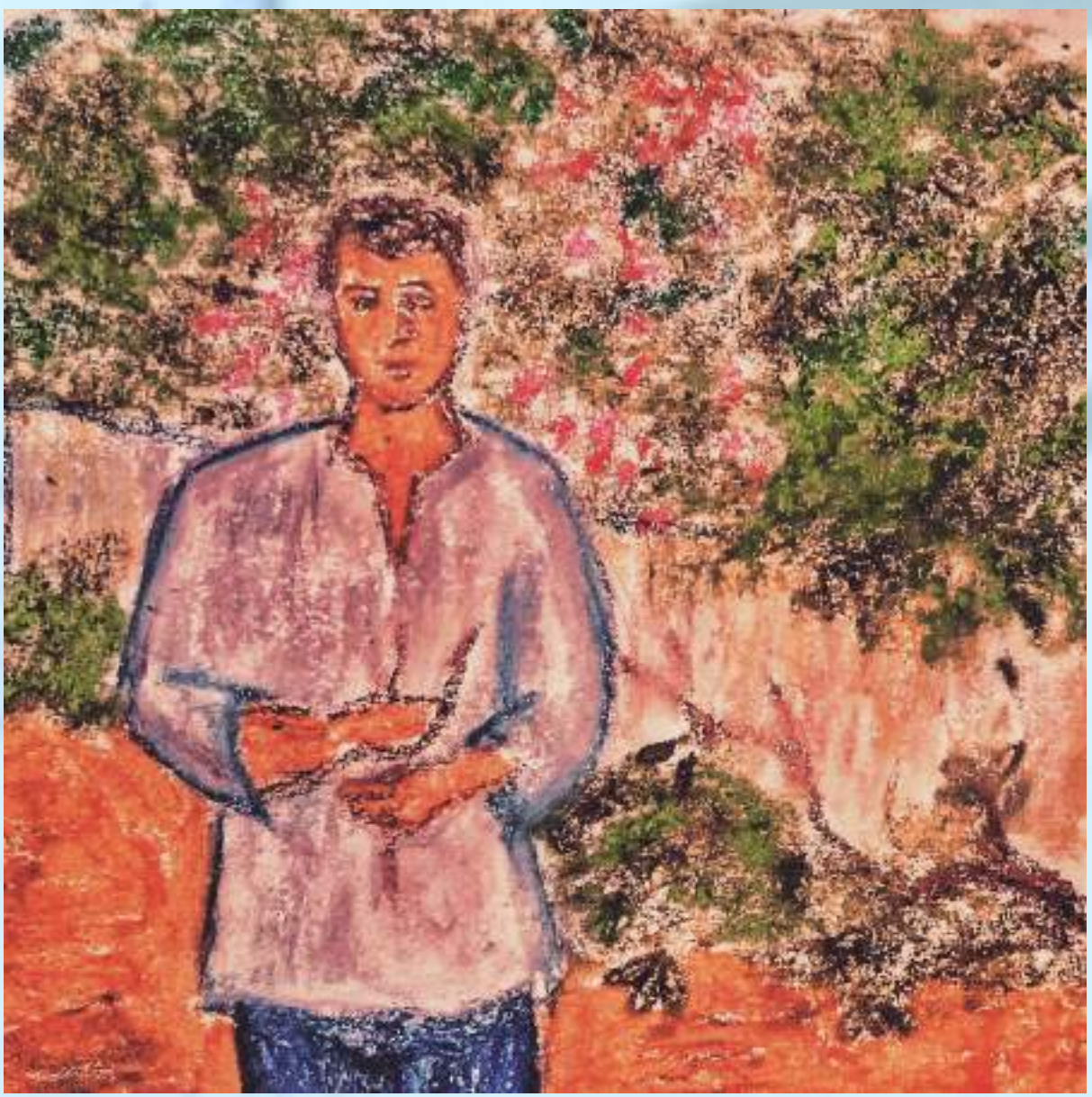

# আমি ও পৃথিবী কখনো দেখা করিনি

## ...সমন্বয়

১.১

অক্ষরের স্বপ্নে আমি কতটা কবি ?
অক্ষরের স্বপ্নে, আমি যদি সহজ জাহাজ
তবে অক্ষর আরশি - তার কাঁচ ছিনতাই
গৃহস্থ সামলে নিয়েছে ছবি

ছবি থেকে ছেঁচে নেওয়া বেগুনী গ্রামের ব্লাউজ
ছেঁচে বের করা মথ সেই ব্লাউজে বসলে
অক্ষর বোবা, অক্ষর কাঁপে

যারা বলে থাকেন, " শব্দ জেলেদের অপেক্ষায় "
তারা দৃশ্যের কোণে জাল বুনতেন - তারাও
পাঠের বাইরের নয়, ভেতরেই-ভেতরেই :
অক্ষরের যোনী থেকে এক জুয়াড়ি বের হয়ে
এ দৃশ্যের পেটে বসলেন

২.২

আমার ভেতরে দূরের কাছের পোশাক
হাত পা সেটিয়ে ঢুকে পড়ছে

আমি কবিতার ভেতরের তোমাকে আর
খুঁজে পাচ্ছি না
আমি শুধুই সরে যেতে চাইছি
কবিতাউৎসব থেকে কারণ আমি তোমাকে
তোমার মুখ চোখ নখ কিছুই খুঁজে পাচ্ছি না

দূরের ও কাছের মুহূর্তেরা আমাকে আর
টান দিচ্ছে না - আমি
অন্ধকার বরফকুচি বোতলে
করে ঘুরছি - সকালে আলোয় মজা
ক্যাপ্টেনের শরীরে ঢেলে দিতে

তুমি হয়তো ভাববে আমার চেহারায়
পুরানো অক্ষরগুলো আজ আর চাবি
করে না - আর হু হু বাতাস এসে
পাল্টে দেয় না পাতা -
আমিও জানি তুমি ভুল নও
তবুও প্রতিটি বীর্যক্ষরণের পর আজও
আমাদের ধ্যান করতে ইচ্ছে করে

১.৩
অথচ সময় কাটতে কাটতে
একটা অক্ষরে করে আঙুল খসে যায়

অথচ তখনও বোঝা যায় না
কম বয়সের কোনো খটকা

মনেই জাকিয়ে বসেছে গ্রহের চিৎকার
দুটি সম্ভব গ্রহের ঠোক্করে ঠোক্করে
দুর্দান্ত ছিটকে যাওয়া কোনো দৃশ্য - অথবা
বার্নিশ করা টেবিল খোলা মাঠে
কয়েকটা পাখির ঠোঁট মস্ত থুতু ঠোকরায়
ঠুকুক... ঠুকুক... কাট টু -

ক্যামেরা অনাবিল তলিয়ে যাবে
মরা করের প্রশ্নে : অক্ষরটা কে -
ঘাতকের আঘাত কেনো লাগে ?

১.৪

মৃত্যুর পাশেই একটা নদী উড়তে থাকে

এক শক্ত দুপুর কুবেরের ফন্দি ছাড়িয়ে
রাতকানা পেরেকের সব রস রাখে সইব্রহ্মে
ওম এর নাভিতে গান্ডু পিঁপড়ের মতন থৈ কে পায়

দৃশ্য বিধুর হলে পর্দা পিতৃজপ করে, করেই

১.৫

রাত কালো বেড়ালের মতো
এ সময় পাশে গুটিয়ে
তার লোমের মাঝে মাঝে শ্বাস
এমন ছবিতে জোনাকি থ্যাঁতলে যায় -
মাতালের দল, কাঙাল হয়েছে বুঝি
তীর্থ, কে দরজা খুলে ছিলো - এখন মানুষ,
আমিও --- স্বাভাবিক হয়ে গেছি !

১.৬

আমি আবার কাছে গেছি,
কালো জামের মতন আলো
ঝুলে আছে। ঘর অথবা সাপুড়িয়ার ঝুপড়িতে -
বাবা, মা ছাড়া আর কোনো গান জানেনা,
সে বোবা হলো। আমি আবার ছায়া গুনে
বাড়ি ফিরলাম - এমন একটা দৃশ্যে একটা
অক্ষর ঢুকে পড়তেই পারে
আমাদের চোখের বাইরে থেকে
১.৭

আমার কবিতার ওপর
একজন দর্জি বসাবো আমি
তার আঙুলের পাশেই মিছিল সেলাই হবে
আমি ধোয়া কাপড়ে স্নান সেরে
ভেজা ও গন্ডগোলের সেই কাপড়টি তাকে
দিয়ে বলবো, " কবিতা করে দিন "

এই কবিতার ওপর শোনো পাখিরা
পুরানো শীতেরা এসে বসবে
তোমরা মশারি বাহির হয়ে দেখবে
স্বাধীনতা দিবসের মতন একটা সবুজ দিন আর
আমি হাতে পেখম বেঁধে উড়বো কয়েকবার
এই কবিতার মতনই, অন্ধ লিফলেট সেজে
মানুষের পায়ে-পায়ে
উড়বো
অলংকার টালংকার সব ক্ষতিতে...
যাবে তোমাদের...

১.৮

মাথার ভেতর থেকে কারা চুরি করে -
দিনান্তে সেতার -

আমাদের দেশে, আমি

করজোড়ে বসি, দেয়ালের কাছে।

আজ জলবায়ু কেমন ছাতচল্লিশের ?
মৃত্যুজন্ম এতো ঝাঁঝালো হওয়ার কথা
ছিলো কি আমার...

আমার ফোনের ওপার থেকে ফোন আসে আমার
ভূমিকার পরিচিতা - বলে:
আত্মারা ফোন করে তোমাকে?
১.৯

আমার গোড়ালি কার বকেয়া গন্ধ ধরে রাখে ?
স্পর্শ শ্বাস আলগা হলে একটি দৃশ্যে
মনে পড়ে : আমি এক মেছোবকের বন্ধু ছিলাম।

মধু ও রঙ মেশানো হালকা দরজা -
সামনে ল্যাটিন পাত্রে কুচি মাছ বসিয়ে ছিলো
মধ্যবয়সী ঢিলেঢালা মুখের মতন

এবার শীতে, আরো বেশী রোদ গলায় জড়াবো -
ঠিক করেছি রেকর্ড গোলোকে ঘুরিয়ে দেবো
লবণের শীৎকার, বালিচর চামড়ার বেঁচে থাকায়
১.১০

অন্ধকারের কোনো হাত পা নেই  শুধু
চোখের শরীর  একটি অন্ধকার প্রতিটি অন্ধকারের থেকে আলাদা আলাদা
হয়ে নিজস্ব ঝুনঝুনি বাজায় চব্বিশটি দৃশ্যে আমি সেই বিসর্গের পথিক হয়ে
আকাশি জলেদের বীজতত্বে কান ঠেকিয়ে রাখি
আরেকটি জলবিন্দু ফাটার আগে  তবে ভুল
আমার গোড়ালি ছাড়ে না ...

বাদামি মাংসওয়ালী
কাঠশব্দ সহযোগে কাটে
সাদা চর্বি
ফল আর সূর্য্য

---

## অনুসূয়া

### ...নির্বেদ

তোমায়; যে গান উৎসর্গের, বর্ণহীনা অনিচ্ছাকৃত
চাদরে জড়িয়ে ফেলেছি--- তার কিছুমাত্রই চেয়েছি
বিস্মৃতিতে;
হীরকন্মোচিত আফ্রিকার শীতে, একখণ্ড কয়লার
উষ্ণতায়, যেভাবে ভেসে যাওয়া আকাশকুসুম বৈভব
পরিচিতি পেয়েছে ভালোবাসার নামে;
তার কিছুমাত্রই চেয়েছি নিলামে,

শূন্য শূন্য শূন্য--- আগ্নেয়গিরির পেটে বেলুন নামলে,
শঙ্খধ্বনি বাজে। হৃদয়াস্যে'র বিমূঢ় আলাপ; যেন কোন
অবরোহনের পাথেয় পথিক দিগভ্রান্ত, ভূয়সী।
নাভিজাত চতুরনয়না, তুমি অনুসূয়া;
ক্লিষ্ট যোদ্ধৃজাতি, আকুলহৃদয়া।

---

**... বসুন্ধরা হালদার**

# উনিশ শতকে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচনার প্রধান অভিমুখ:-

...আকাশ মুখার্জী

ইতিহাসকে বলা হয় বোবার চিৎকার। কিন্তু ঐতিহাসিকরা সেই নীরব সময়ের ছবি তুলে ধরতে সক্ষম। তবে কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় এই বিষয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক ভিন্ন ভিন্ন ছবি তৈরি করেন।

ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য নিবিড় পাঠে দেখতে পাই যে এটি কোনো ধ্রুববাদী বিষয় নয়, নয় সংবাদপত্রের ধাঁচে আপাত নিরপেক্ষ বস্তুনিষ্ঠ বিবরণী। ইতিহাস বহুলাংশেই একটি ডিসকোর্স, বানিয়ে তোলা বিষয়। তা যদি না হত, তাহলে কোনো একই ঐতিহাসিক বিষয়ের উপর পরস্পরবিরোধী মত দেখা যেত না। দেখা যেত না, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির বিভিন্ন প্রস্থান বা স্কুল।

আসলে ইতিহাস রচনা করেন যে ঐতিহাসিক তার উপর থাকে দেশ-কাল গত প্রভাব। কালিক ও স্থানিক প্রভাবে নির্মিত জয় ব্যক্তি ঐতিহাসিকের চিন্তাজগৎ। এই চিন্তাজগতটি আবার নিয়ন্ত্রিত হয় তার সমকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় – বিবিধ বিষয়ক মতাদর্শ দ্বারা। এভাবেই ব্যক্তি ঐতিহাসিক নির্মিত হন দেশ-কালের ফসল হিসাবে।

উনিশ শতকে যখন আমাদের বাঙালীর ইতিহাস – বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস রচিত হল – তা নিছক শৌখিন ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে নয়। তার পিছনে রইল নানা তাগিদ, নানা উদ্দেশ্য যা সম্মিলিতভাবে তৈরি করেছিল উনিশ শতকীয় এই সাহিত্যের ইতিহাস রূপ একটি ডিসকোর্স, যা নানাবিধ মতাদর্শের প্রভাবে প্রায় একটি ম্যানিফেস্টোও হয়ে উঠেছিল বলা চলে।

বাঙালীর যে জাতি নামক ধারণা গঠনের সময়কাল তা উনিশ শতক। বাঙালীর এই ইতিহাস সন্ধানের মধ্যে নিহিত ছিল নিজেকে আবিষ্কার

করা, নিজেকে অতীতের সাপেক্ষে বিচার করা ও তুলে ধরার তাগিদ। আধুনিকতা নামক যে ঔপনিবেশিক ধারণা, সেই ধারণার একটি অপরপক্ষগত বাইনারি নির্মাণে একটা নির্দিষ্ট কালখন্ডকে তুলে আনা হয় মধ্যযুগ হিসাবে। বাঙালী প্রবর সমাজ সমকালীন আধুনিকতাকে বিচার করতে চেয়েছিলেন তাদের নতুন পাওয়া আধুনিকতার ধারণার অপরপক্ষ 'মধ্যযুগ' নামক কালিক ধারণার সাপেক্ষে। সেই দিক থেকে বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের উনিশ শতকীয় নির্মাণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় এই 'মধ্যযুগ'এর নির্মাণ।

বাঙালী বলতে কোন বাঙালী? এখানে অবশ্যই কলকাতাস্থিত মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথা বলা হচ্ছে। এই সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেই গড়ে ওঠে জাতীয়তাবোধের এক পাশ্চত্যগত ধার করা ধারণা। সেই সময়ে আধুনিক শিক্ষা বলতে অবশ্যই পাশ্চাত্যশিক্ষা। এই পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবেই বিশেষে এই সম্প্রদায়ের মধ্যে ইওরোপীয় জাতিরাষ্ট্রগত জাতীয়তাবোধের ধারণা গড়ে ওঠে। কার্যক্ষেত্রে এই ইওরোপীয় মডেলকে সামনে রেখেই জাতিগঠন ও জাতীয়তাবোধের গঠনকার্য শুরু করা হয়েছিল বললে খুব ভুল বলা হয় না।

জাতীয়তাবোধ বিষয়ে দু'টি ইওরোপীয় আন্দোলন সেই সময়ের বুদ্ধিজীবিদের বিশেষ নাড়া দিয়েছিল – ইতালীর ঐক্য আন্দোলন ও জার্মানির পুনর্গঠন আন্দোলন। লক্ষ্য করা যায় যে, এই আন্দোলন দু'টিতে সাধারণ বিষয় হিসাবে ছিল – জাতির গৌরবোজ্জ্বল অতীতের সন্ধান। এই প্রক্রিয়াটি সেই সময়ে বাঙালী বিদগ্ধ সমাজ অনুসরণ করলেন, অবশ্যই ইওরোপীয় সংস্কৃতির অনেকটাই প্রতিস্পর্ধী হিসাবে। এই প্রতিস্পর্ধার কারণ? জাতিগঠন করতে গেলে নিজস্ব স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্কৃতি ও স্বর্ণালী অতীত রূপ বিষয়ক ধারণার প্রয়োজন দেখা দেয়। তা বাঙালী যখন স্বতন্ত্র জাতি হিসাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে চাইছে তখন তারও চাই একটা নিজস্ব ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রাচীনত্বের ধারণা। এই ধারণা বাঙালীও গড়ে তুলতে চাইল, কিছুটা আপোস-রফা করেই।

আপোসের দরকার ছিল কারণ সেই সময়ে বাঙালীর লিখিত রেডিমেড ইতিহাস ছিল না। অর্থাৎ বাংলার প্রাচীন-মধ্য যুগে বাঙালীর কোনো হেরোডোটাস জন্মাননি, ইতিহাস হিসাবে ইতিহাসকে রচনাবন্দী করে রাখার জন্য। ফলে প্রাথমিক ধারণার জন্য নির্ভর করতেই হয়েছিল মার্শম্যান প্রমুখ কলোনিয়াল ইতিহাস রচয়িতাদের উপরে, কারণ বাঙালী তখনও পর্যন্ত নিজের ইতিহাস সন্ধান করে উঠতে পারেনি।

এই কলোনিয়াল ইতিহাস কখনোই নিরপেক্ষ ইতিহাস নয়। আসলে ঔপনিবেশিক যুগে উপনিবেশিকদের তাদের নিজেদের দখলিকৃত উপনিবেশের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য ছিল প্রজার কাছে সেই উপনিবেশ স্থাপনের একটা ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা। এটাই দেখাতে চাওয়া যে তাদের পূর্বতন শাসকের আনলে যেরকম অবিচার চলত, তা থেকে তারা একরকম অবতারের মতোই মুক্তি দিতে এসেছে এই প্রজাদের। স্বাভাবিকভাবেই উপনিবেশ পূর্ববর্তী শাসনকালকে 'ডার্ক এজ' হিসাবে তুলে ধরার একটা চেষ্টা ছিল। সেক্ষেত্রে আমাদের দেশের মুঘল ও সুলতানি শাসনকে অশুভ হিসাবে তুলে ধরেছিল তারা। কোনো বিকল্প না থাকায় সমকালীন বিদগ্ধ বাঙালী সমাজ একপ্রকার বিনা বিচারেই মেনে নেয় এই মতকে, যা জাতীয়তাবোধের মধ্যে হিন্দুত্ব, মুসলমান বিদ্বেষ তথা সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মুসলমান সমাজের অবদানকে প্রাথমিকভাবে অস্বীকার করার মতো বিষয়গুলোকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। দেখা যাবে যে বঙ্কিমচন্দ্র, রমেশচন্দ্র, রঙ্গলাল প্রমুখের ঐতিহাসিক আখ্যানে বারবার এই হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্বই উঠে আসবে। বলতে গেলে বেছে বেছে তাদেরই জাতীয়তার অতীত নায়ক হিসাবে গড়ে তোলা হয়েছিল, যাদের সাথে তথাকথিত মুসলমান শাসকদের দ্বন্দ্ব সংঘাতের অবিকাশ গড়ে উঠেছিল, যথা – শিবাজী, সংগ্রাম সিংহ, রানা প্রতাপ, পৃথ্বীরাজ চৌহান – এমনকি পদ্মাবতী বা পদ্মিনীর মতো অনৈতিহাসিক কাল্পনিক চরিত্রও।

এই বিষয়ে আমাদের বারবারই ফিরে আসতে হবে। কিন্তু একটা বড় বিষয় যে, বাঙালী তার স্বর্ণালী ঐতিহ্যের সন্ধানে সাহিত্যের ইতিহাসকেই বা বেছে নিল কেন? রাজনৈতিক ইতিহাস যে ক্ষেত্রে

অধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। আসলে বাঙালীর 'জাতি' হিসাবে জোটবদ্ধতার মূল উপাদান হয়ে উঠেছিল ভাষা। এই ভাষার ঐশ্বর্য প্রতিফলিত হয় সাহিত্যে। ফলে বাংলা ভাষার এই প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারণা থেকে জাতীয় গৌরববোধও পোক্ত হয়। ফলে বিশেষত এই প্রাচীন সাহিত্যের গৌরবগাথাকে নতুন করে লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন পড়েছিল। এছাড়া আরেকটি কারণ হিসাবে বলা যায় যে বাংলার লিখিত রাজনৈতিক ইতিহাস ছিল না। অন্তত ইতিহাস হিসাবে তো লিপিবদ্ধ ছিল না। কিন্তু নবনির্মিত এই মধ্যযুগীয় সময়ের কোনো বিষয় সামনে এলেই অনিবার্যভাবে এসে পড়ত বিভিন্ন সাহিত্যিক রেফারেন্স। ফলে প্রাচীন সাহিত্যের ইতিহাসকে নতুনভাবে জাতীয়তাবোধের ভিত্তি হিসাবে তুলে ধরতে সচেষ্ট ছিলেন বাংলার বিদগ্ধকুল।

এই সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্য দিয়েই বাঙালীর ভাষার কৌলিন্যের মধ্যে দিয়ে জাতির কৌলিন্য প্রকাশের চেষ্টা চলেছে। প্রাচীন ভারতীয় যে ঐশ্বর্যমন্ডিত সংস্কৃত সাহিত্যের অমৃতধারা, বাংলা সাহিত্য যে তারই এক সমৃদ্ধ শাখা এমন বিষয় প্রমাণের চেষ্টা হয়েছে। সকলেই তাদের রচনায় এই বিষয় প্রকাশ করতে চেয়েছেন যে, সংস্কৃত ভাষা থেকেই বাংলা ভাষার উৎপত্তি এবং তার সপক্ষে বিবিধ প্রমাণ হাজির করেছেন। আরেকদিকে ছিল ম্যাক্স মুলার সাহেবের জনপ্রিয় নৃতাত্ত্বিক ধারণা। তিনি নানাভাবে যে 'নর্ডিক' আর্য জাতির রক্তগত উৎকর্ষের ধারণা দিয়েছিলেন, তার প্রভাবে বাঙালীর দিক থেকে জাতিসূত্রে খাঁটি আর্যত্ব লাভের চেষ্টাচরিত্র শুরু হয়েছিল। এর প্রভাবও সাহিত্যের ইতিহাসগুলিতেও পড়েছিল। তাছাড়া যদি দেখা যায় সেই সময়কার ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু পুনর্জাগরণের যে ঢেউ উঠেছিল, তার প্রভাবও ছত্রে ছত্রে ছড়িয়ে আছে, বিশেষত উনিশ শতকীয় সাহিত্যের ইতিহাসমূলক রচনাগুলিতে। মূলধারার সাহিত্য – সংস্কৃতির ইতিহাস থেকে মুসলমান সম্প্রদায়ের অবদান ও ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার মানসিকতা এই বিষয় প্রভাবেই উত্থিত হয়।

শুধু ইতিহাস রচনা নয়, বাঙালীর লোকজ বা তথাকথিত গ্রামজীবনের ঐতিহ্য, যা নাগরিক সংস্কৃতির বাইরে তার স্বরূপ সন্ধান শুরু হয়। গ্রামীন সংস্কৃতিকে যে সেই সময়ে আমাদের জাতীয় জীবনের শিকড় হিসাবে গ্রহন করা হয়েছিল, তার পিছনে ছিল ইওরোপীয় রোমান্টিকতাবাদের প্রভাব। শিল্প বিপ্লবের সময় নাগরিক ধূলি-ধূসরিত যাপন থেকে শস্য-শ্যামলা 'কান্ট্রিসাইড' এর দিকে ফিরে যাওয়ার যে তাগিদ থেকে গ্রামজীবনের প্রতি রোমান্টিকতা বোধ গড়ে উঠেছিল, তার প্রভাবেই বাঙালীরও গ্রামীন  সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টি পড়ল। শিকড়ের স্বরূপ সন্ধানের মাধ্যমে আত্মস্বরূপের উপলব্ধির তাগিদে রূপকথা, গীতিকা, পাঁচালী, লোককথা প্রভৃতি লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন সংরূপকে খুঁজে বার করার চেষ্টা হল। রেভারেন্ড লালবিহারী দে'র 'ফোকটেলস অফ বেঙ্গল', দক্ষিনারঞ্জন মিত্র মজুমদার এর 'ঠাকুমার ঝুলি' থেকে দীনেশচন্দ্র সেন এর পূর্ববঙ্গ গীতিকার সংকলন এই চেষ্টারই ফসল। মূলধারার সাহিত্যের ইতিহাস সন্ধানের সমান্তরালে এটিও ছিল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ অভিমুখ।

প্রথমদিকে কিন্তু অতটা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বাংলা সাহিত্যের একটা পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার কাজ শুরু হয়নি। বিক্ষিপ্ত টুকরো-টাকরা লেখা থেকে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনার মডেল অবধি আসতে অনেকটা সময় লেগেছিল। প্রথম প্রচেষ্টা হিসাবে আমরা ধরতে পারি ঈশ্বর গুপ্ত'র 'কবিজীবনী'র কথা। নিধুবাবু, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ ছাড়াও রাম বসু, রাসু-নৃসিংস, হরু ঠাকুর, কেষ্টা মুচি, ভোলা ময়রা, অ্যান্টনী ফিরিঙ্গি প্রমুখ উপনিবেশ ঘেঁষা আপাত অপ্রাচীন কবিওয়ালাদের জীবনী সংগ্রহ করেছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত এবং প্রকাশ করেছিলেন ১৮৫৩-১৮৫৫ এর মধ্যে তাঁর সম্বাদ প্রভাকর পত্রিকায়। একে এক ধরণের আর্কাইভ করনের প্রথম প্রচেষ্টা বলা যেতে পারে।

এরপর হরিশচন্দ্র মিত্র একটা ছোট বই লেখেন ১৮৬৬ তে। এই বইতে প্রাচীন কবিদের মধ্যে কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস, মুকুন্দ চক্রবর্তী, রামপ্রসাদ এবং অখ্যাত জনৈক নন্দকুমার চক্রবর্তীর জীবনী জায়গা করে নেয়। কিছু পরে ১৮৬৯ এ প্রকাশিত হয় হরিমোহন

মুখোপাধ্যায়ের ‘কবিচরিত’। এতে জায়গা পায় কৃত্তিবাস, মুকুন্দরাম, কাশীরাম, রামপ্রসাদ, ভারতচন্দ্র ছাড়াও আরও ঈশ্বর গুপ্ত ও মদনমোহন তর্কালঙ্কারের মতো তথাকথিত আধুনিক যুগের কবিদেরও জীবনী।

এরপরে দেখা যায় খুব সিরিয়াসভাবে মধ্যযুগের সাহিত্যের দিকে নজর পড়ছে বাঙালী বিদগ্ধশ্রেণীর। পূর্ণাঙ্গ না হলেও টুকরো-টাকরা প্রবন্ধ রচনার মধ্য দিয়ে সমগ্রতার দিকে এগোনোর চেষ্টা দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে যদিও ১৯৫২ সালে রঙ্গলাল বম্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' অগ্রগন্য, কিন্তু সেটা প্রাথমিকভাবে লিখিত প্রবন্ধ তো নয়। বেথুন সোসাইটিতে দেওয়া তার এক বক্তৃতা। এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এই কারণেই যে এই বক্তৃতাতেই প্রথম বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনত্বগত কৌলিন্যের প্রসঙ্গ সচেতনভাবে উঠে আসে। এরপরে আসে বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরাজি প্রবন্ধ ‘বেঙ্গলী লিটারেচার' যা ১৮৭১এ প্রকাশিত হচ্ছে ক্যালকাটা রিভিউ পত্রিকায়। উল্লেখযোগ্য যে ইওরোপীয় মতে সন -তারিখের উল্লম্ব মাপকাঠিতে ইতিহাসকে পর্যায়ক্রমে সাজিয়ে তোলা এবং এবং বিচারের সুবিধার্থে তাকে কয়েকটি কালখন্ডে ভাগ ভাগ করার মতো প্রক্রিয়াকে তুলে ধরলেন তিনি। এছাড়াও তার সম্পাদিত ‘বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় বিভিন্ন এই বিষয়ক রচনা প্রকাশ করিয়েছেন তিনি, যেমন – শ্রীকৃষ্ণ দাসের ধারাবাহিক রচনা ‘চৈতন্য', রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধ ‘বিদ্যাপতি' প্রভৃতি। এছাড়াও ভারতচন্দ্র রায়গুনাকরের বিষয়ে মূল্যায়ণমূলক প্রবন্ধ লেখা হচ্ছে এই পত্রিকাতেই।

বাংলা সাহিত্যের এই ইতিহাসকে প্রথম পূর্ণাঙ্গ রূপ দিয়েছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পন্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন। তাঁর এই প্রচেষ্টার ফসল ছিল ‘বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', প্রকাশিত হয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে।

রামগতি ন্যায়রত্নের এই প্রকল্পে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল উল্লম্ব কালিক বিন্যাসে এই ইতিহাসকে সাজিয়ে তোলা এবর বিচার ও আলোচনার সুবিধার্থে কয়েকটি ঐতিহাসিক কালখন্ডে ভাগ করে

নেওয়া – “বাঙালা ভাষার অবস্থাভেদে আমরা আদ্য, মধ্য ও ইদানীন্তন নামে তিনটি কালের কল্পনা করিয়াছি এবং প্রথম হইতে চৈতন্যদেবের পূর্ব্ব পর্যন্ত কালকে আদ্যকাল, চৈতন্যদেব হইতে ভারতচন্দ্রের পূর্ব্ব পর্যন্ত কালকে মধ্যকাল এবং ভারতচন্দ্র হইতে অদ্য পর্যন্ত কালকে ইদানীন্তনকাল নামে অভিরহিত করিয়াছি”। রামগতি ছিলেন বিদ্যাসাগরের অন্যতম পছন্দের শিষ্য। বিদ্যাসাগর যে সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস লিখলেন – ‘সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব', হিসেব মতো তারই অনুপ্রেরণায় গ্রন্থনাম রেখেছিলেন রামগতি। কিন্তু বিদ্যাসাগর এই সাহিত্যের বর্গবিভাগ করেছিলেন যেখানে সংরূপের ভিন্নতার হিসাবে, সেখানে রামগতি ন্যায়রত্ন প্রাধান্য দেখ কালিক বিন্যাসকে।

রামগতির এই বই কেবলই যে সাহিত্যের ইতিহাস নয়, নব্য হিন্দু জাতীয়তাবাদের এক পরোক্ষ প্রচার গ্রন্থ তা বলাই বাহুল্য। তার ভাবনা চলেছিল অবশ্যই ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের মতো ইন্টেলেকচুয়াল বাঙালী নব্য হিন্দুত্ববাদের রাস্তায়। এই গ্রন্থে খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রকল্পগত দিক থেকে হিন্দু – মুসলমান দ্বিজাতিতত্ত্ব ও হিন্দু স্বর্ণযুগ – মুসলমান খলনায়কত্ব বিষয়ক জনপ্রিয় ধারণার প্রভাব আছে। তেমনই আছে আর্যত্বের কাঙালপনা ও ব্রাহ্মণ্যবাদীতা। এর সাথে যুক্ত হয়েছিল ভাষা – সংস্কার বা বাংলা ভাষা থেকে আরবি-ফারসি জাত বিজাতীয় শব্দ তুলে নিয়ে সংস্কৃত তৎসম ভাষা যোগে তাকে আরো হিন্দু ভাষা করে তোলার প্রকল্প, যা হ্যালহেড – মদনমোহন থেকে বিদ্যাসাগরে এসে একপ্রকার স্থিতাবস্থা লাভ করেছিল।

আর একদিকে ছিল উনিশ শতকীয় ‘নারী'র পরিচয় ও সামাজিক স্থান নির্মাণের প্রকল্প। উনিশ শতক ঐতিহ্যের নামে নারীকে যে প্রকার পতিব্রাত্য, সতীত্বের শিক্ষা দিতে চেয়েছিল – তা সেই সময়কালের মনোজ্ঞ প্রবন্ধাবলী থেকে বাজারচলতি জনপ্রিয় আখ্যানে পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে। সেই প্রভাব থেকে রামগতি খুব স্বাভাবিকভাবেই মুক্ত নন। সীতা, সাবিত্রী, দয়মন্তী প্রমুখের মতো সতী চরিত্রের পাশাপাশি ‘বেহুলা'র মতো বাঙালী সতী চরিত্রের নির্মাণ - এই প্রকল্পের অংশ

হিসাবেই রামগতি করেছেন। এছাথাও ছিল প্রচন্ডভাবেই ভিক্টোরীয় নৈতিকতা সুবাসিত কামগন্ধহীন প্রায় ব্রহ্মচর্যাশ্রম আশ্রয়কারী হিন্দুত্বের ভ্রান্ত ধারণা। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে, বঙ্কিমচন্দ্রের মতো নীতিবাগীস, যিনি এক নব্য হিন্দু গৃহ্যসূত্র রচনা করছেন বাঙালীর জন্য, ভিক্টোরীয় নৈতিকতা যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে, তারও নেতিবাচক সমালোচনা করছেন রামগতি – সেখানে মাইকেল, হুতোম, টেকচাঁদ অনেক দূরের কথা। অশ্লীলতাবোধের এই বাড়াবাড়িতে বাঙালী নারীর সামান্যতম পাশ্চাত্যায়ণের চিহ্ন দেখলেই উদ্বিগ্ন হচ্ছেন তিনি। এই সমস্ত মোটিভ থেকেই তাঁর সাহিত্যের ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যময়তা ফুটে উঠেছে। রামগতি ন্যায়রত্ন সংস্কৃতানুসারী স্থবিরত্বেই তার আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন।

এরপর আসেন দীনেশচন্দ্র সেন। বাংলা পূর্ণাঙ্গ সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় আরো এক ধাপ এগিয়ে, তিনি নির্ভর করলেন বস্তুনিষ্ঠ গবেষণার উপর। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রচনা করলেন তার বিখ্যাত গ্রন্থ ‘বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'। এই গ্রন্থে অবশ্যই রইল জাতীয়তাবোধ ও বোধিকে চাঙ্গা করার উদ্দেশ্য। কিন্তু সংস্কৃতানুসারী কুপমুন্ডকতাতে নয়। বরং তথাকথিত মূলধারার সাহিত্যের সমান্তরালে লৌকিক সাংস্কৃতিক সংরূপগুলির সন্ধানে যেতে চান বঙ্গ সংস্কৃতির শিকড়ে, তার গ্রামজীবনে।

দীনেশচন্দ্র সেন সেই হিন্দু-মুসলিম কচকচি থেকে অনেকটা বেরিয়ে এসেছিলেন এবং সুপ্রাচীন বাংলার বৌদ্ধ ঐতিহ্যের দিকেও তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। তাঁর এই গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ের নামই ‘হিন্দু ও বৌদ্ধযুগ'। এই গ্রন্থে বহু জায়গাতেই তিনি তথাকথিত হিন্দু পাঠ্যে বৌদ্ধ প্রভাব এর উল্লেখ করেছেন। এই গ্রন্থ ও অন্যান্য গ্রন্থেও দেখবো যে বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর ধারণা ও আচার এর পিছনে বৌদ্ধ প্রভাব জনিত বিষয় নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন, যেখানে একবগ্গা হিন্দু ঐতিহ্যের বিকল্প চিন্তার প্রস্থান বা স্কুলিং অত্যন্ত ক্ষীণ। এই ব্যাতিক্রমীদের মধ্যে ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামদাস সেন, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ ব্যক্তি, যারা

বৌদ্ধ সংস্কৃতি বিষয়ে উৎসাহী প্রাবন্ধিক তথা গবেষক ছিলেন। দীনেশচন্দ্রের সাথে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সুসম্পর্ক 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' তথা অন্যান্য গ্রন্থে প্রাচীন সাহিত্যে বৌদ্ধ প্রভাব বিষয়ক আলোচনার অন্যতম কারণ। আবার হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সাথে পরবর্তীকালে সম্পর্কছেদের কারণেই 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' এ জায়গা পেল না ১৯০৭ এ আবিস্কৃত চর্যাপদ, যেখানে ১৯২৬শে পঞ্চম সংস্করণ বেরিয়েছে এই বইয়ের।

দীনেশচন্দ্র সেন বিভিন্ন স্থানে যে মধ্যযুগে বাঙালীর হিন্দু – বৌদ্ধ – মুসলিম, বিশেষত হিন্দু – মুসলিম সুসম্পর্কের প্রসঙ্গ বার বার আনছেন, তার অন্যতম কারণ অবশ্য রাজনৈতিক। ১৮৮৫ তে হাতিয়ার কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর যে হিন্দুত্ববাদী জাতীয়তাবাদকে সরিয়ে রেখে, এক হিন্দু – মুসলমান আলিঙ্গনাবদ্ধ নিখিল ভারতীয়ত্ববোধের ধারণা আসতে চাইল, তার পূর্নতা এল বঙ্গভঙ্গের কালে ঐক্যবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তায়। দীনেশচন্দ্র সেনের গবেষণা তথা বাংলা সাহিত্য গবেষণায় মধ্যযুগে যে হিন্দু – মুসলমান সমাজ ভ্রাতৃবোধে আবদ্ধ ছিল, এমন বিষয় প্রমাণের দায় নিয়ে এল এই সমস্ত রাজনৈতিক তাগিদ। এই প্রমাণের দায় এবং নবোত্থিত মুসলমান বিদগ্ধ সমাজের সাথে পত্রিকাযুদ্ধের ফলে বাংলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে মুসলমান সমাজের অবদান বিষয়ক সন্ধানের সূত্রপাত হয়। দীনেশচন্দ্র সেনের 'ময়মনসিংহ গীতিকা' বিষয়ক বক্তৃতা তথা ১৯৩৭এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে মুসলমানের অবদান' বিষয়ক বক্তৃতাতে (যা পরে স্বতন্ত্র বই হিসাবে মুদ্রিত হয়) একই সুর দেখা যায়। তিনি বাংলার সাহিত্য – সংস্কৃতির ত্রিবেণীসঙ্গম নামে উল্লেখ করেছিলেন 'বৌদ্ধ – হিন্দু – মুসলমান' সংস্কৃতিকে।

অপরদিকে বাংলা সাহিত্যে পুথি-কেন্দ্রিক গবেষণার গুরুত্বও বুঝিয়েছিলেন যারা, তাদের অন্যতম দীনেশচন্দ্র সেন। এমনকি যেসব জনপ্রিয় পুথি ভুল পাঠ নিয়ে মুদ্রিত হয়েছিল, নিবিড় পুথি পাঠে তাদেরও ভুল সংশোধন করেন তিনি। যেখানে রামগতি ন্যায়রত্নের মুদ্রিত গ্রন্থ কেন্দ্রিক বিচারে মত ছিল। পুথিকেন্দ্রিক বিচারের বিপক্ষে

তাঁর এক অদ্ভুত মত ছিল যে, অমুদ্রিত পুথি সমালোচনায় ব্যবহার করলে কৌতুহলী পাঠকের তা পাঠ করার উপায় থাকে না। এই মতকে নস্যাৎ না করেও দীনেশচন্দ্র সেন যেভাবে হস্তলিখিত পুথির উপর ভিত্তি করে তাঁর সমালোচনার ধারা অব্যাহত রাখেন, তার ফলে শিক্ষিত পাঠকের কাছে অনেক বেশি বিশ্বাসযোগ্যতা ও অপরিহার্যতা পেয়ে যায় 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'।

তাছাড়া আগেই বলা হয়েছে যে শিকড় সন্ধানে লোকসাহিত্যের দিকে বিশেষ নজর ছিল দীনেশচন্দ্রের। 'গোপীচন্দ্রের গান', 'ময়মনসিংহ গীতিকা' র মতো বিষয়ের সংকলন ও সম্পাদনা তারই ইঙ্গিতবাহী। এছাড়াও তাঁর লেখা ১৯২০ সালে প্রকাশিত 'ফোক লিটারেচার অফ বেঙ্গল'এ রচিত রয়েছে এর কৈফিয়ত। বাঙালী জাতির শিকড় যে এই পল্লীগ্রামই এবং লোকজ সংস্কৃতির সন্ধান যে জাতির নিজের শিকড়েরই সন্ধান, এমন জাতীয়তাবাদী ধারণা থেকেই যে দীনেশচন্দ্র এ কাজে নিযুক্ত এমন ধারণা পাওয়া যায়। এমনকি জাতীয়তার স্বার্থে এরকম অসম্ভব মন্তব্য করতেও ছাড়েন না তিনি যে, লোককথার কাহিনীগত সাদৃশ্য থেকে মনে হয়, ইওরোপে যে লোককাহিনী প্রচলিত, তার উপাদান বঙ্গদেশ থেকেই গিয়েছে। বাঙালীকে উজ্জীবিত হতে উদ্বুদ্ধ করছেন তিনি। বাঙালীকে জাতি হিসাবে তার শিকড় সন্ধানে উৎসাহিত করছেন এবং তার অপরিহার্যতার বিষয়েও মত দিচ্ছেন – "স্বদেশের এরূপ পুরাতন ও পরিচিত ভাবের সঙ্গে যাহাদের কোনো সংস্রব নাই, তাঁহাদিগকে খাঁটি স্বদেশী বলিব কী প্রকারে এবং তাঁহারাই বা দেশের প্রতিনিধি হিসাবে সর্ব্বত্র পরিচয় দিবেন কী ভরসায়?" এইরকম দর্শনে লিখিত এই মহাগ্রন্থ অত্যন্ত মূল্যবান হয়ে উঠল তাদের কাছেই যারা জাতীয়তার ঢেউয়ে সজ্ঞানে বাঙালী হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন।

তবে 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য'এর নিবিড় পাঠে দেখা যায় যে পূর্ববঙ্গের প্রতি আলাদা একটা পক্ষপাতিত্ব ছিল তাঁর। পূর্ববঙ্গে বহু প্রাচীন কবি, ঐতিহাসিক ব্যাক্তিত্বের অবস্থিতি এবং পূর্ববঙ্গের সাথে গঙ্গাপাড়ের বহু বিখ্যাত কবির যোগাযোগ দেখিয়ে তিনি ভাঙতে চেয়েছেন পূর্ববঙ্গের

অগৌরব। কারণ ‘বাঙাল' নামক পূর্ববঙ্গীয় পরিচয় কলকাতা কেন্দ্রিক সংস্কৃতিতে ছিল বড়ই অগৌরবের। ‘বাঙাল'দের নিয়ে ঠাট্টা – তামাশা – অসম্মান এর যে জায়গা কলকাতাস্থিত লেখককুল তথা বহু প্রাচীন কবিই তৈরি করেছিলেন, তা ঘোচাতে দীনেশচন্দ্রের চেষ্টা ছিল লক্ষ্যনীয়। পূর্ববঙ্গের সন্তান দীনেশচন্দ্রের জন্মভূমির প্রতি এক অর্ঘ্যই বলা যেতে পারে একে।

যাই হোক, এই সমস্ত গ্রন্থ থেকে বোঝা যায় যে রামগতি – দীনেশচন্দ্র প্রমুখ বাঙালীর ইতিহাসকার জাতিগঠনের উদ্দেশ্যে তৈরি করতে চেয়েছিলেন একটা যৌথ গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি, যে সামুহিক স্মৃতি সহায়তা করবে বাঙালীর জাতি হিসাবে জোটবদ্ধতায়। এই যৌথ অতীত স্মৃতি নির্মাণের উনিশ শতকীয় প্রচেষ্টা যে বিফলে যায়নি তা বলাই বাহুল্য।

## মেঘ যদি রোজ বৃষ্টি কাঁদে
## তোমায় আমায় কাঁদায় কিসে!?

...শুভব্রত সামন্ত

...স্বাগত দাস

# মিনি - বেড়াল

## ...কৌশিকী ভট্টাচার্য

ঋতুরা আগে থাকতো বড়োবাজারের একটা গলিতে।নীচে ওর পাপার দোকান, ওপরে ও, ওর মা আর বড়োপাপা।তারপর ওরা দেশে চলে এসেছে। ওর দাদু অসুস্থ হওয়ার পর। ক্ষেতি সামলানোর কেউ নেই নাকি! ঋতুর বেশ ভালোই লেগেছিলো যদিও। দেশের বাড়িটায় ও আগেও গ্যাছে। সেখানে ইয়াব্বড় সব ধানক্ষেত৷ তার মাঝের সরু রাস্তাটা দিয়ে ওরবয়সী ছেলেমেয়েরা কাগজের পাখা বানিয়ে ছুটে বেড়ায়।গ্রামটা মূল জামশেদপুর ছাড়িয়ে অনেকটা ভেতরে৷ বেঁটেখাটো - মোটাসোটা পাহাড় দিয়ে ঘেরা৷ সেগুলো দেখলেই মনে হয় এক লাফে টপকানো যায়।

গ্রামে এসেছে ওরা অনেকদিন হলো। সারাদিন বাড়িতে থাকলে খেলে বেড়াবে ভেবে, ওর মা আর পাপা একটা খেলনা- বাড়ির মতো স্কুলে ওকে ভর্তিও করে দিয়েছিলো।কিন্তু কি একটা অসুখ চারদিকে, তাই স্কুলও বন্ধ।তাতে অবশ্য ওদের খ্যালার কোনো বিরাম নেই। ঋতু, কাজরি, শিখা আর ওদের দলবল। গ্রামের সবাই ' বানর সেনা ' বলে ডাকে।

এখন সেপ্টেম্বর মাস। সারাদিন বৃষ্টি। সন্ধ্যেবেলা খেলে ফিরে, হাত - পা ধুয়ে সবে ঋতু দুধ-মুড়ি নিয়ে বসেছে জানলার ধারে। মিনি এসে হাজির। কিন্তু ওকে মিনি বলে ডাকলে বড়োরা রেগে যায়। কানমুলে দ্যায়। কেউ বিশ্বাস করতে চায়না ঋতুকে।

---

" মে মাসের এই ভ্যাপ্সা গরমে মেয়েটা দ্যাখো ছাদে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অ্যাই মিনি, শুনতে পাচ্ছিস না? নেমে আয় বলছি এখুনি। " - মিনির মা অনেকক্ষণ ধরে চিৎকার করে চলেছেন। মিনির হয়েছে যতো জ্বালা৷ দিব্যি স্কুলে যাচ্ছিলো। ফেরার পথে আইসক্রিম নিয়ে ওরা বন্ধুরা বাসে উঠতো।কি একটা ছাই কারণে সব বন্ধ। মা ওমনি চান্স পেয়ে ওকে সঙ্গে করে চলে এসেছে ফুলমনিদের বাড়ি। ফুলমনিদের বাড়ি ব্যাপারটা, মিনির এক্কেবারে পছন্দ নয়।এখানে সবাই ওকে এড়িয়ে চলে। ও যে সবাইকে খুব ভালোবাসে তাও নয়।

আসলে গতবার বর্ষার পর থেকেই বিশেষ করে ওর এখানে আসার সব ইচ্ছে চলে গ্যাছে।সেবারও মায়ের কাছে অনেকবার ঘ্যানঘ্যান করেছিলো ও, সঙ্গে ওকে না নেওয়ার জন্য।কিন্তু মা খুব দুঃখ করে বলেছিলো, মামারবাড়ির আর কেউ নাকি মায়ের সাথে কথা বলেনা, ফুলমনিরা ছাড়া। সেসব শুনে নাক টেনে মিনি শেষে রাজী হয়েছিলো। এখানে এসে মা তো ওকে ভুলেই যায়৷ ফুলমনি আর মেজ- দিদুনই সব তখন।ও আর কি করে! ফুলমনির মেয়ে টিম্পুর সাথে ভাব করলো৷ তা একদিন বিকেলে টিম্পু বললো, " মাঠে হান্ড্রেড মিটার রেস আছে, আমি, আমার বন্ধুরা নাম দিয়েছি কম্পিটিশনে, তুই দিবি?" মিনি ভাবলো ওর নতুন স্নিকার্স। খুব ছুটতে পারবে। জিততে পারলে সবাই ওকে সমীহ করবে। এমনিই ইংরেজি বেশি জানে বলে ওকে বেশ উঁচু নজরে দ্যাখে এরা।

বিকেলবেলা মাঠে সবাই হাজির। বৃষ্টি হয়ে কাদা সমস্ত মাঠে। তাও কম্পিটিশন হবেই। মিনিদের ডাকলো একজন টাকমাথা লোক। লাইন করে দাঁড়িয়ে পড়লো ওরা। বাঁশি বাজতেই, দে ছুট। মিনিই সবচেয়ে এগিয়ে। কিন্তু হঠাৎ মাঝখান থেকে একটা ছেলে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছিলো।

মিনির সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়লো, ক্লাসে সুরঞ্জনা ওকে বলেছিলো, আগের স্পোর্টসে ও নাকি প্রীতি কে ল্যাং মেরে পিছিয়ে দিয়েছিলো। মিনি তো রীতিমতো সুরঞ্জনার থেকে ল্যাং মারা শিখেছেও। একবার চেষ্টা করে দেখলে ক্যামন হয়! তারপর য্যামন হয় আর কি। মিনি তো জিতে গ্যালো, কিন্তু সে কি রাগ টিম্পুদের দলের সবার! ওই ছেলেটা নাকি ওদের দলের। বরাবর ফার্স্ট হয় সব রেসে। সবাই ছেলেটার একবাক্যে কথা বলা বন্ধ করে দিলো মিনির সাথে। এমনকি টিম্পুও। রাতে মা কে গলা জড়িয়ে সেসব বলতে গিয়ে আরেকচোট বকুনি খেলো মিনি। মনে মনে খুব রাগ হয়েছিলো ওর। তাও পরদিন সকালে উঠে ও টিম্পুকে রাজী করালো। ওই ছেলেটাকে ওর ভাগের একটা ওয়েফার দিয়ে সরি বলে আসবে। সকালের আলোয় এসব নাকি হয়না, তাই টিম্পু আর ও দুপুরবেলা পৌঁছোলো মাঠের ধারে। মিনিকে দেখে সবাই মুখ বেঁকিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইলো। এদের মধ্যে আগেরদিনের ছেলেটাকে চিনতে পারলো ও। রাগ হলেও, শক্ত করে হাত মুঠো করতে পারলোনা, ওয়েফার টা যদি ভেঙে যায়। কিন্তু ছেলেটার দিকে এগিয়ে যেতেই সবাই গোল হয়ে ঘিরে ফেললো ওকে। কাছাকাছি হয়ে ছেলেটা কীভাবে জানি এক ধাক্কা মারলো! আর ও সঙ্গে সঙ্গে কাদার ওপর। সুতির ফ্রকটা ভর্তি কাদা তখন। ও দেখলো সবাই হাসছে। টিম্পু খুব হাসি চাপার চেষ্টা করলেও ও যে সব আগে থেকেই জানতো সেটা বুঝতে মিনির সমস্যা হলোনা। ও চলে এসেছিলো সেদিন। তারপরেও দুদিন ছিলো ওরা, কিন্তু মিনি আর বেড়োয়নি বাড়ি থেকে।

" হ্যাঁ রে, পেয়ারাগুলো যে পড়ে আছে! তুই কি আসবিনা? " - এবার নীচে না নামলে ভীষণ রেগে যাবে মা। তাই কুট্টি কে কোল থেকে নামিয়ে মিনি সিঁড়ি দিয়ে নেমে এলো দুমদাম করে৷ মা বল্লো " হাত ধো আগে, দিনরাত পড়ে

আছে বেড়ালটা কে নিয়ে। হাত না ধুয়ে খাবিনা।" মা যে ক্যানো বেড়াল বলে ডাকে! মিনি এখনও শেখাতে পারলোনা ওর নাম - কুট্টি। আচ্ছা, কুট্টি কি পেয়ারা খায়? খেলে দু - একপিস নাহয় লুকিয়ে নেবে ও।
গতবারের সেইদিনের পর আর কিছুতেই মিনি ওদের কাছে যাবেনা জানতো। সেদিন অপমানে ও কাউকে কিছু বলেনি। এবারে সেইযো মার্চ মাসে এসেছে ওরা তখন থেকে এখনও অব্দি টিম্পুর সাথে কোথাও যায়নি মিনি। ফুলমনিদের ছাদের এককোণে তখনই ও কুট্টিকে পেয়েছিলো৷ সাংঘাতিক ছোটো, নরম একটা উলের বলের মতো। এখন ওর হাত, পা, চোখ, নাক সব বোঝা যায়। কুট্টিও আদর পেয়ে ছাড়েনি মিনিকে। দুজন এখন দুজনের বন্ধু হয়েছে। মিনি ছাদে না উঠলে জানলা দিয়ে কুট্টি ঢুকে পড়ে ওর ঘরে।

---

সবকথা শুনে ঋতু ঘাড় নাড়লো। কাজটা যে ওরা ঠিক করেনি পরিষ্কার করে সবাইকে বুঝিয়ে দিলো। তবে ঋতুর মনে ঘটনাটা বিঁধে রইলো। তাই আবার টিম্পুদের বাড়ির জানলায় মেয়েটা কে দেখেই ও ভেবে নিয়েছিলো ওর কাছে যেতে হবে। আর কিছু না হোক, ওর ভাগের সরিটা ওকে বলতেই হবে। টিম্পুর থেকে জানলো ও নাকি এসে থেকে এখনো অব্দি ভালো করে কথা বলেনি কারুর সাথে। তাই ওকে বাইরে নিয়ে আসা সম্ভব না। সুযোগ হিসেবে এলো, টিম্পুর জন্মদিন। ওদের সবার নেমন্তন্ন। ওই মেয়েটা গোলাপী রঙের একটা স্কার্ট আর সাদা জামা পরে বসেছিলো একটু দূরে। কোলে একটা বিড়ালছানা। ঋতু ওর দিকে তাকিয়ে হাসার চেষ্টা করলো, মেয়েটা কিরকম অদ্ভুত ভঙ্গিমায় মুখ ভ্যাঙালো। আশ্চর্য হয়ে দেখলো ওর

কোলের বেড়ালটার মুখটাও ঠিক ওরকম। ঋতু ওরকম হাঁ করে তাকিয়ে ছিলো বলে, মেয়েটা কোল থেকে নামিয়ে ছেড়ে দিলো ওকে। তারপর নিজেও ভেতরের ঘরে চলে গ্যালো। ঋতুরা যতোক্ষণ ছিলো আর আসেনি ও বাইরে।

---

সেদিনকে বিকেল অব্দি বেজায় গরম। ঠিক বিকেল করে বৃষ্টি নামলো। ঋতু জানে আজ আর খেলতে বেরোনো হবেনা।তাই পিংপং বল নিয়ে ক্যাচ ক্যাচ খেলছে, হঠাৎ ওই মেয়েটার মতো দেখতে বেড়ালটা উঠে এসেছে ওর জানলা দিয়ে। ঋতু একবার ভাবলো তাড়িয়ে দেবে, কিন্তু ভয় পাচ্ছিলোনা বেড়ালটা।ঘাড় বেঁকিয়ে পা মুড়ে বসলো। যে মেয়েটা ওকে পাত্তা দিলোনা, তার বেড়ালকে ঋতু পাত্তা দেবে এ দুঃস্বপ্নেও ভাবা যায়না। ও নিজের মনে তখনও বল নিয়ে খেলছে।

- " কি ব্যাপার? রাগ করেছিস? সেদিন কথা বলিনি তাই? হ্যাঁ। "একদম স্পষ্টই শুনেছে ঋতু৷ ও তাকালো জানলার দিকে। " আমি মিনি রে। ও! তুই তো আবার আমার নামও জানিসনা।" টিম্পুর জন্মদিনের দিন ওদের বাড়ির লোকের মুখে শুনে মেয়েটার নামটা জেনেছিলো ঋতু। ও বিশ্বাস করতে পারলোনা। বেড়ালটার মুখটা এখন, অবিকল মিনির মতো।

গাড়ির শব্দে ও খানিকটা সোজা হলো। নীচে মুখ বাড়িয়ে দেখলো ওর পাপা গাড়ি নিয়ে বেরোচ্ছেন। গ্রামে আসা অব্দি তো গাড়িটা পড়েই ছিলো৷। নিশ্চয়ই শহরে গেলেন! ওকে না বলেই! ছুটে হাঁপিয়ে ও নেমে এলো নীচে। মা কে দেখে ভয় করলো ওর। মুখখানা কিরকম ফ্যাকাশে। কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই জানলো টিম্পুদের বাড়ির বাচ্চা মেয়েটার নাকি খুব অসুখ৷

তাড়াতাড়ি শহরে নিয়ে যেতে হবে। ঋতুর ধাঁধার মতো মনে হচ্ছিলো সব। একবার মনে হলো ছুটে গিয়ে বাইরে দ্যাখে। তারপর ওই বেড়ালটাকে মনে পড়লো।

---

দুধ - মুড়ির বাটিটা চুমুক দিলে গোঁফ হয় একটা সুন্দর। ঋতু সেটা চাটে না কোনোদিন। মিলিয়ে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে।মিনি এখন ওর বন্ধুই। শুধু কেউ বিশ্বাস করেনা। শহর থেকে আর কোনো খবর এসেছে কিনা তাও জানেনা ঋতু। ঠোঁটের ওপরের দিকটা, যেখানে গোঁফ হয়েছে ফুলিয়ে ঋতু তাকালো মিনির দিকে। হাতটা চেটে নিয়ে মিষ্টি করে হাসলো মিনি। কানদুটো খাড়া হয়ে উঠলো ওর।

---

...নৈরিক

...দেবস্মিতা সেনগুপ্ত

# বিদায় বেলার ভৈরবী

## ...অর্পণ ঘোষ

জীবন হঠাৎ  ম্যাপের মতন স্পষ্ট হয়ে ওঠে।
জলের মধ্যে ভাসিয়ে দেওয়া আয়না-
কোনো এক রাত্রে দেখা একটুকরো চাঁদের মতন-
আদিম ছবি নিয়ে-
জোনাকিদের কাঁধে চেপে -
ভোরের ঘুম ভাঙিয়ে  দিয়ে যায় চুপিসারে।
কুয়াশায় মোড়া সমুদ্রের সেই ক্লান্ত নৌকা
বিষণ্ন মনে এসে ভেড়ে স্মৃতির লণ্ঠনে।
অস্পষ্ট ভাবে নিভে যায় অন্ধকারের চাদর।
অর্থহীন মেঘ জমাট হয়ে আসে।
মেঘলা সকাল পাহাড়া দেয় ...
মৃত্যু যেন ডিঙিয়ে যেতে  না পারে
মরণমুখী জীবনের জ্যান্ত কবিতাকে।

# ৩ নং হিথ ভিলা,হ্যামস্টেড

**...দেবার্ঘ্য কুমার চক্রবর্ত্তী**

যাত্রা শুরু হলো, সালটা ১৯১২।কলকাতার জোড়াসাঁকো নিবাসী সম্ভ্রান্তবংশীয় এক ভদ্রলোক , গালে কাঁচাপাকা দাড়ির সমাবেশ, উজ্জ্বল চোখ, পরনে বেশ লম্বা পোশাক,কলকাতা থেকে রওনা দিলেন লন্ডনের উদ্দেশে। এ তাঁর প্রথম লন্ডন যাত্রা নয়। এর আগেও তিনি লন্ডন গেছেন আইনশাস্ত্র পঠনপাঠনের জন্য। এই বার তিনি এক নন, সাথে আছেন ছেলে রথীন্দ্রনাথ এবং ত্রিপুরার মহারাজা।
গ্লাসগো হয়ে এসে পৌঁছালেন তিনি লন্ডন শহরে। যাতায়াতের সমুদ্রপথে আর কিছুটা গ্লাসগো শহরেই নিজের রচনার ইংরেজি অনুবাদের কাজ তাঁর এগিয়ে গেছে। একটা খাতা শেষ। কলম ছুঁয়েছে দ্বিতীয় খাতা।

ডোভার থেকে লন্ডন শহরে এসে তারা চাপলেন বিখ্যাত লণ্ডন পাতালরেলে,যা লন্ডনের সাবেকী সম্বোধনে লন্ডন টিউব নামে পরিচিত। কিছুক্ষণ বাদে ট্রেন থেকে নেমেই বোঝা গেলো বিপত্তিটা। অনুবাদের প্রথম খাতাটা হারিয়ে গেছে। খাতাটা ছিল একটি ব্রিফকেসের মধ্যে। এখন ব্রিফকেস সহ সম্পূর্ণ খাতাটাই বেপাত্তা। পাঠিয়ে দিলেন ছেলে রথীন্দ্রনাথকে ইনকোয়ারি অফিস। সে যাত্রা ভাগ্য ভালো ছিল, বেকার স্ট্রিটের স্টেশন অফিস থেকেই পাওয়া গেলো হারিয়ে যাওয়া ব্রিফকেস।
পরদিন সকালে তারা পৌঁছালেন হ্যামস্টেড। এখানেই বাড়ি বিখ্যাত ইংরেজ চিত্রকর রথেনস্টাইনের। ১৯১১ সালে, মানে এর ঠিক আগের বছর এই চিত্রকর এসেছিলেন কলকাতায় জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়িতে আর এক

চিত্রপ্রেমী অবন্ ঠাকুরের সাথে দেখা করতে। তখনই এই লন্ডনযাত্রী মানুষটির সাথে তাঁর আলাপ এবং সখ্যতা।

রথেনস্টাইনের হ্যামস্টেডের ১১ ওক হিল পার্কের বাড়ির দরজায় টোকা পড়লো। দরজা খুললেন রথেনস্টাইন। তার চৌকাঠের ঠিক এপারে দাঁড়িয়ে তারই এক বছর আগে আলাপ হওয়া বন্ধু, বাঙালীর হৃদয়ের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ঘরে এসে রথেনস্টাইন কবিগুরুর কাছে শুনলেন তাঁর খাতা হারাবার ঘটনা। কাছেই ৩ নম্বর হিথ ভিলাতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেলো।

এগিয়ে চললো কবিগুরুর অনুবাদের কাজ।লিখলেন নতুন গান , বাঁধলেন নতুন সুর। এখানেই রচিত হল “সুন্দর বটে তব অঙ্গদখানি, তারায় তারায় খচিত”।

[ হ্যামস্টেডে এখানেই কবিগুরু থাকতেন ]

৭ই জুলাই বিখ্যাত ইংরেজ কবি ইয়েটস কবিগুরুর  অনুবাদ পাঠ করলেন রথেনস্টাইনের বাড়িতে, শ্রোতা  এভিলিন আন্ডারহিল,আরনেস্ট রিস, অ্যালিস মেইনেল প্রমুখ লেখক। সকলেই উচ্ছসিত। কবিগুরু সেই প্রসঙ্গে পরে তাঁর এক বন্ধুকে জানান যে  “ সবার এহেন উচ্ছাস আর প্রশংসা সত্যি আমার কাছে অভাবনীয় এবং গ্রহণের উর্দ্ধে।”

এরপর নভেম্বর ১লা, গীতাঞ্জলির অনুবাদের ১০৩ টি অনুবাদ “সং অফারিং”  নামে প্রকাশিত হলো মাত্র ৭৫০ টি কপি নিয়ে ইন্ডিয়ান সোসাইটি অফ লন্ডন থেকে। তারপরের বছর কবিগুরুর আমেরিকা যাত্রার সময়

পুনরায় বইটি ইয়েটসের ভূমিকা সহকারে প্রকাশ পেলো ম্যাকমিলান প্রকাশনী থেকে।

ইংল্যান্ড তথা বিশ্বদরবারে কবিগুরুর উপস্হিতিটি ক্রমশ উজ্জ্বল হতে থাকে। তাঁর পোস্ট অফিস নাটক অন্তর্ভুক্ত হয় আইরিশ নাট্য গোষ্ঠীর নাট্যতালিকায়। তাঁর লেখা নিয়ে জনমানসে এবং শিল্পীমহলে এক বাঁধভাঙা উচ্ছাস ক্রমেই জন্ম নিতে থাকে।

সেই বছর টমাস স্ট্রাগে মুর কবিগুরুর নাম নোবেল কমিটির কাছে সুপারিশ করেন। তারপর আসে ১৬ ই নভেম্বর , ১৯১৩। টেলিগ্রাম পৌঁছায় কবিগুরুর কাছে, নোবেল পুরস্কারের সাহিত্য বিভাগে তিনি এবারের বিজয়ী। শান্ত সমাহিত কবির মন্তব্য. “ যাক বিশ্বভারতীর কাজটা আরো এগোবে এবার” । ভাবতে অবাক লাগে কবির বিপুল সৃষ্টিভান্ডারের মাত্র ১০৩ টি অনুবাদ তাঁর হাতে এনে দিয়েছিল সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শিরোপা। তাঁর সমগ্র রচনাবলী নোবেল

কমিটির হাতে পৌছালে হয়ত তাঁর হাতে শোভা পেত আরো একাধিক এরকম সম্মান।

এর প্রায় অনেক বছর বাদের কথা। ১৯৩২ সালে রথেনস্টাইনের বাড়িতে কবির চিঠি পৌছালো, কবি লিখেছেন " আমার এই সব প্রাপ্তি সম্পূর্ণ অভাবনীয় এক দুর্ঘটনা ,যার জন্য তুমি আর সর্বপিরী ইয়েটস দায়ী"।

কবির চিঠির প্রতুত্ত্যরে রথেনস্টাইনের প্রতিক্রিয়া জানা যায়না।হয়তো হ্যামস্টেডের সেই বাড়িতে, সেই ঘরে যেখানে কবির যাত্রাপথে ঘটেছিল চিরকাঙ্ক্ষিত অভাবনীয় দুর্ঘটনা, সেই ঘরেই চিঠিটা ফের খামে ভরে চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে স্মিত হেসে রথেনস্টাইন বলে উঠেছিলেন আজকের পুরো পৃথিবীর মতোই—

" এইজন্যই সত্যি তুমি কবি নও, বিশ্বকবি "

……..

**...নিলোফার আলি শা**

# মুক্তি

## ...হিন্দোল সরকার

বাড়িতে সম্মান আর অবশিষ্ট নেই বড় বউয়ের। মুখার্জী বাড়ির বড় বউ বলে কথা, পুরো গ্রাম যে বাড়িকে সম্মান করে, যাকে বলে রাজ রক্ত, ব্লু ব্লাড। তার রক্তই কিনা শেষ পর্যন্ত --- ! ছি ছি ছি!

পাড়া শুদ্ধ লোক কানাকানি করে। শ্বশুর মশাই রেগে আগুন।

শাশুড়ি নির্জনে কপাল চাপড়ায়, স্বামী মাথানিচু করে দিন কাটায়, সেটা বউয়ের কৃতকর্মের জন্য, নাকি নিজের শিরদাঁড়া ভঙ্গুর থাকার জন্য তা বোঝা যায় না।

বাড়ির অন্য দুই বউ মুখ টিপে হাসে,

বেশ হয়েছে। যেমন বেআক্কেলের মতো চলাফেরা ছিল বড়দির, বেশ হয়েছে , যেমন কুকুর তেমন মুগুর।

বড় বউ যদিও কিছু বলে না, হাহুতাশ করে না, রাগ ও করে না, কষ্ট ও পায় না । ছেলে খোকনকে নিয়ে বসে থাকে ঘরের এক কোণে, নিজের শোয়ার ঘর থেকে বেরোনো একরকম প্রায় নিষিদ্ধ, যাওয়ার মধ্যে বাথরুম,পায়খানা এইটুকুই। বাড়ির কাউকে ছোঁয়া বারণ, রান্নাঘরে ঢোকা বারণ— সবকিছুতেই নিষেধাজ্ঞা।

সারাদিনে দুই জা পালাকরে এসে দরজার সামনে তিনবেলা খাবার রেখে যায়, জল রেখে যায়।  ফিরে যেতে যেতে বড় বউয়ের দুরবস্থা দেখে মুচকি

হাসে, বড় বউ সব বোঝে। কিছু বলে না, তার নতুন করে আর কিছুই বলতে ইচ্ছে করে না এই বাড়ির কোনো মানুষকে। খোকন মাঝে মাঝে আসে মায়ের কাছে, ছোট মানুষ এসব পুতপবিত্রতা বোঝে না, তাছাড়া ওকে ঠেকিয়েও রাখে যায় না, বাড়ির সবার দৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে ঠিক চলে আসবে মায়ের কাছে। এসে চুপচাপ বসে থাকে মাকে জড়িয়ে ধরে, কিছু যে একটা ঘটছে তার মাকে কেন্দ্র করে এটুকু খোকন বোঝে। আধোকন্ঠে সে জিজ্ঞেস করে,

মা, তোমার কাছে আসতে চাইলে সবাই আমায় আটকে রাখে কেনো?

মা বলে, আমি অন্যায় করেছি যে সোনা।

খোকন ড্যাবড্যাব করে তাকায় মায়ের মুখের দিকে, মা অন্যায় করতে পারে একথা খোকনের বিশ্বাস হয় না।

—কী করেছ তুমি?

মা খোকনের প্রশ্নের কোনো উত্তর দেয় না।

আলগোছে জড়িয়ে ধরে খোকনকে বুকে টেনে নেয়।

ওদিকে বড়বউয়ের স্বামী হৃদিরঞ্জন বাপ-অন্তপ্রাণ ছেলে, বাপের নির্দেশে এখন আলাদা ঘরে শোয়, বউয়ের সাথে শোয় না। বউয়ের সাথে কথাও বলে না। স্বামীর এমন আচরণও নীরবে মেনে নিয়েছে বড়বউ। বিয়ের পিঁড়িতে বসার মা গোপনে কানে কানে বলেছিল, পরের ঘরে গিয়ে মেয়েদের মানিয়ে নিতে হয়।

পরের ঘর সেই পরই থেকে গেছে , আপন আর হয়নি ।

ওই ঘটনার পর থেকে যেন আরো বেশি পর লাগছে এই বাড়ি। একদম অচেনা।

কী ঘটনা?— ঘটনা তেমন বিশেষ কিছু না ,

কিছুদিন আগে স্বামী পুত্র সহযোগে পুরুলিয়া ঘুরতে গেছিল বড় বউ। সেখানে একটা একসিডেন্ট হয় তার, প্রচুর রক্তক্ষরণ হয় শরীর থেকে। হসপিটাল থেকে বলে রক্ত প্রয়োজন, কিন্তু বড় বউয়ের ব্লাড গ্রুপের সাথে কারো ব্লাড গ্রুপই মিলছিল না, শেষ পর্যন্ত হাসপাতালের এক কর্মচারী, স্থানীয় সাঁওতাল যুবকের রক্তের গ্রুপের সাথে মিলে যায় বড়বউয়ের রক্তের গ্রুপ। ডাক্তার তাই আর দেরি না করে সাথে সাথেই রক্ত দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং সেই যাত্রায় সেরে ওঠে বড় বউ, সুস্থ হয়ে ফিরে আসে বাড়ি।

কিন্তু ঝামেলা বাঁধে বাড়ি ফেরার পর; শ্বশুর যখন জানতে পারেন তাঁর আদরের বড় বউয়ের শরীরে এখন বইছে আদিবাসী নীচু জাতের কালো রক্ত, মুহূর্তে তার মুখের ভাব পাল্টে যায়, হায় হায় করে ওঠেন শাশুড়ি, বিলাপ শুরু করেন, এ কী করলে ভগবান! এ আমার কী সর্বনাশ করলে গো! শেষপর্যন্ত এক কালা উপজাতির রক্ত বামুন বাড়ির বউয়ের শরীরে!

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ান শ্বশুর মশাই, শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমোহন মুখার্জী— এলাকায় বিদ্বান শিক্ষক এবং শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে যথেষ্ট সম্মান আছে তার, নামের আগে ওই শ্রীযুক্ত সম্ভাষণ সেই সম্মানই বহন করে চলেছে সগৌরবে; আপাতত সমস্ত ঘটনা শুনে তার চোখ রক্তবর্ণ।

সম্মান প্রতিপত্তি বংশমর্যাদাকে আজীবন রক্ষা করে এসেছেন মুখার্জিকর্তা। প্রাণ চলে যায় যাক কিন্তু বংশমর্যাদা রক্ষা করা চাই।

গম্ভীর গলায় তিনি বাড়ির সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলেন ,
রক্ত মানুষের শরীরের সবচেয়ে দামি জিনিস। বড় বউমা সেই রক্ত দূষিত করে এসেছে। যতদিন না আমি বৌমার এই অন্যায় কাজের শাস্ত্রস্বীকৃত কোনো প্রতিবিধান খুঁজে না পাচ্ছি ততদিন বৌমা এই বাড়িতে অচ্ছুৎ। আমার এই আদেশ যেনো সবার মাথায় থাকে।

আদেশ জারি করে কৃষ্ণমোহন বাবু গটগট করে বেরিয়ে যান ঘর থেকে, উনি বেরিয়ে যাওয়ার পর একে একে বেরিয়ে যান শাশুড়ি, স্বামী, দেওর, জা সবাই ।
বড় বউ একলা বসে থাকে ঘরে, সন্ধে হয়ে আসছে, অন্যদিন হলে তাকেই মন্দিরে সন্ধ্যাপ্রদীপ জ্বালাতে হতো, আপাতত সেই দায়িত্ব থেকে সে মুক্তি পেয়েছে।

...সহস্রাব্দী ব্যানার্জী

...রূপম মাল

# শব্দখেলার ধারাবিবরণী

## ...প্রমথেশ ভূঞ্যা

১.

শব্দগুলো এগোতে থাকে,
মোড়ের মাথায় জমায়েত কোরে তারপর শুরু হবে ওদের মিছিল!

একটু পরেই ঝুপ করে সন্ধ্যে নামবে,
জীবাশ্মের পতাকা নিয়ে এগিয়ে চলা মিছিল ল্যাম্পপোস্টের আলোয় আরও স্পষ্ট হবে!

বাগানের বাদশাহী গোলাপ তখন অন্ধকারে ভোরের শিশিরের প্রতীক্ষায় প্রহর গোনে,
মিছিলের স্লোগান তার কানে পৌঁছে একের পর এক স্মৃতিচূর্ণ বের করে আনে!

কোনো শব্দ থামে, কেউ বা থামেনা!
জীবাশ্মের ঝান্ডাগুলো বিবর্ণ হয়ে যায় না!

২.

ক্লান্ত এক শব্দ পরদিন সূর্যোদয় দেখবে বলে ঠিক করে,
কাকের ডাকে তার ঘুম পিছলে যায় ভোরে!

এরপর দ্রুতপায়ে আঘাতের সিঁড়ি বেয়ে ছাদে উঠে যায় সে,
শ্যাওলাভরা ছাদের পাঁচিল দেখতে দেখতে ক্রমশঃ রঙিন হওয়া আকাশকে না দেখেই সে ছদ্মবেশী বলে দ্যায়।

হাসনুহানার গন্ধকে অভিযানে সামিল হতে দেখে বেচারা বাগান বেহালা বাজায়,
এলোমেলো শব্দ তাকে সান্ত্বনা দিয়ে গন্ধরাজের গল্প শোনানোর ব্যর্থ চেষ্টা করে!

গোধূলির রঙে আঁকা শব্দ স্পষ্ট হতে গিয়ে সন্ধ্যের ডায়রির কাটাকুটি লেখা হয়ে যায়,
সদ্যজাত শব্দকে দেখে প্রসবযন্ত্রণা সত্ত্বেও আনন্দাশ্রু ফ্যালে স্মৃতি!

৩.

নিরবচ্ছিন্নতা চিতায় জ্বলে,
অপ্রত্যাশিত হাঁসে!
অস্তিত্বের বাগানে নতুন শব্দের অঙ্কুরোদ্গম হয়!

মাতাল শব্দ নিজেকে বিরহী ভেবে ভুল গাছে ফোটায় ফুল,
ব্যর্থ কবির সঙ্গে লুকোচুরি খেলাটাকে চানাচুরপ্রেমী শব্দ!

নিজের গোলকধাঁধাকে অসীমের কাছে বন্ধক দিয়ে হাট থেকে ছন্দ কেনে শব্দ,
তারপর পান্ডুলিপিতে নিশ্চিন্ত আশ্রয় নেয়!

অহংকারের সিঁড়ি বেয়ে নিজেকে আত্মঘাতী তলোয়ার বানায়,
তারপর? ধীরে ধীরে বিলীন হয় অনুতাপে!

.....

## Audio visual page

...আগমনী মণ্ডল

Song : "Dugga Elo"
Singer : "Monali Thakur"
Composer : "Guddu"
Lyricist : "Indranil Das"
Cover By : "Agamani Mandal"

https://drive.google.com/file/d/1Oj0NsgRsb0632SCBBwhF4_jqz4OFl_5T/view

# রাষ্ট্রীয় শোক

## ...নির্বেদ

গোলচোখ করে তাকাও,
পেটের মধ্যে কব্জা করেছে আলো।
জীবনরেখা মার্জিন করে ঘিরে রেখেছে
আঁকিবুকির মাঝে সাধারণ বিন্দু---

দেশের ত্রিসীমানায় ডুবসাঁতার দিচ্ছি
আপাতত।
খাবি খেয়ে খেয়ে খিদে মরে গেছে;
নুনপোড়া জল--- শরীর নিংড়ে
নিয়েছে শামুক।

পাহাড়ি ঠান্ডায় জ্বর আসে না।
জঙ্গুলে ছাদ--- আলো, মখমলের আলো লাল-নীল
রং করে দিচ্ছে মুখের ভাঁজে;
অবসর-তাক থেকে ছবি পেড়ে
বাহবা দিচ্ছে বাদামওয়ালা।
থানার সামনে বিড়ি খাচ্ছে হাবিলদার,
ট্রাফিক সামলাতে সামলাতে।

# Series: Untitled

...সৌরিণ দাস

# আইরিশ মেয়েটির জন্য

## ... আহেলী দে

মেঘ করে আসে কলকাতার ফুটপাতে। ভাঙ্গাচোরা ট্রামরাস্তা পেরিয়ে মেঘেরা পৌছে যায় ডালহৌসি কিংবা ধর্মতলা চত্তরে। এক পশলায় ভিজিয়ে দেয় সেই সব মানুষ গুলোকে যারা আজও মৃত্যুর পরোয়া করেনা। আগাছা বেড়ে চলে। ঢেকে দেয় মানুষের হাত পা, চোখ নাক মুখ, এমনকি ফুসফুস পর্যন্ত। শহুরে কোন বন্দরে নৌকা বেধে বসে থাকে মাঝি, জোনাকিদের অপেক্ষায়। রাত বাড়লে যারা এসে ভিড় করে মাঝির চারপাশে। কত কত গল্প লেখা থাকে তাদের গায়ে। কত প্রেমিকের আত্মহত্যা, কত পরিযায়ী শ্রমিকের চোখের পানি, কত বাহারী ব্যালকনির সৌখিনতা।

মাঝি তাদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে। আর গান বাঁধে। যে গান বন্দর পেরিয়ে ভেসে যায় আয়ারল্যান্ডের কোন ছোট্ট গ্রামে। হয়তো কোন মেয়ে ফসল বুনছে সেখানে। তার চারপাশে গুনগুন করে ভেসে বেড়ায় সে গান।

"Come over the hills, my bonnie Irish lass
Come over the hills to your darling
You choose the road, love, and I'll make the vow
And I'll be your true love forever..."

ভালোবাসা কখন যেন গোলাপ হয়ে ফুটে ওঠে মেয়েটির বুকে। সুদূরের সেই মাঝি তখন বন্দরে বসে বাঁশি তে সবে সুর তুলেছে। ভোর হয়ে আসে। জোনাকিরা আবার পাড়ি জমায় দূরের দেশে। নতুন কোন গল্প খুঁজতে। আর মেয়েটা? যে কিনা আজীবনের মত সে গানে মাতাল হয়ে মৃত্যুকে উপেক্ষা করলো।

"এ কলকাতার মধ্যে আছে আরেকটা কলকাতা..."

আজ ধীরেন বাবুর সাথে দেখা করার কথা আমাদের। আমাদের মানে আমার আর কুশলের। আলাপ করার জন্য। পুরোটা arrange করেছে কুশলই।

এবার ধীরেন বাবুর পরিচয়ে আসা যাক। না উনি কোন ফিল্ম স্টার বা খুব চেনা পরিচিত কোন মুখ নন। বলা যায় একেবারে অন্ধকার জগতেরই মানুষ। ধীরেন বাবু মাগীর দালাল। শিয়ালদার রেড লাইট এরিয়ার খুব চেনা মুখ তিনি।

ওনার স্ত্রী এবং উনিই মুলত ব্যবসা টা সামলান। ওনার স্ত্রী নিজেও কিছুদিন আগে অব্ধি দেহব্যবসার সাথে যুক্ত ছিলেন। এখন বয়সের ভারে রিটায়ারমেন্ট নিয়েছেন বলা যায়। বেশ কিছু মেয়ে এখন তাদের অধীনে কাজ করে। ভালই পসার।

ধীরেন বাবুর কাছে যেতেই তার স্ত্রী আমাদের জন্য চা মিষ্টি নিয়ে এলেন। ভদ্রলোক যে এত অমায়িক না দেখলে বিশ্বাস করতাম না। কত কথা বলতে থাকলেন নিজে থেকেই। ছোটবেলা কেটেছে কিভাবে। কিভাবে এই লাইনে এলেন। তারপর নমিতা বউদি অর্থাৎ ধীরেন বাবুর স্ত্রী তার সাথে কিভাবে আলাপ হল তার। রাজনীতি, ফুটবল সব নিয়েই আড্ডা জমে উঠলো। তবে সেসব গল্প না হয় আর একদিন হবে। আমি গান গাই শুনে আমায় অনুরোধ করলেন সলিল চৌধুরীর কিছু গান শোনাতে। শোনালাম 'আহবান শোনো আহবান' গানটা। তারপর বললেন হেমন্ত মুখার্জীর কিছু শোনাতে। তাও শোনালাম। হঠাৎ মাথায় একটা প্রশ্ন আসতে সেটা না জিজ্ঞেস করে থাকতে পারলাম না।

- আচ্ছা ধীরেন বাবু আর একটা প্রশ্ন করতে পারি?

- আজ্ঞে করুন না

ধীরেন বাবু জবাব দিলেন।

আমি বেশ কৌতূহলী হয়েই জিজ্ঞেস করলাম।

-আচ্ছা আপনার স্ত্রী যে দেহ ব্যবসার সাথে যুক্ত ছিলেন। বলা যায় আপনিই তার খদ্দের নিয়ে আসতেন, তা আপনার খারাপ লাগেনি কখনো।

ধীরেন বাবু অদ্ভুত ভাবে একটু হাসলেন। তারপর বললেন আপনি তো গান শোনালেন এবার আমি একটা গান শোনালে শুনবেন?

তারপর নিজেই উঠে গিয়ে ভাঙ্গাচোরা ডিভিডি টা অন করে চালালেন-

"How many roads must a man walk down
Before you call him a man?
How many seas must a white dove sail
Before she sleeps in the sand?
Yes, 'n' how many times must the cannon balls fly
Before they're forever banned?
The answer, my friend, is blowin' in the wind
The answer is blowin' in the wind... পরন্ত বিকেলের রোদ্দুর তখন ঘরের লাল মেঝেতে এসে পড়েছে। দূরে চোখ যেতে দেখলাম নমিতা বৌদি ওপাশের দরজার ফাঁকা দিয়ে উকি মেরে দেখছেন। আমি এতদূর থেকেও অনুভব করলাম ওনার চোখ টা একটু হলেও ভিজে গেলো।

.....

# বাঁশি

## Audio visual page : দীপ নন্দী

https://drive.google.com/file/d/1EiJLgK_eaGN_bYT19-2Sua9vE77UVfBR/view?usp=sharing

**A girl with messy hair: ...অঙ্কিতা আলী**

# চেয়ে দেখি

## ... ঋভুব্রত পাল

যখন ব্যথা করে বুকে
চারপাশে চেয়ে দেখি কতো লোক
বেঁচে আছে কঠিন হৃদরোগ নিয়ে,
তাদের ব্যথা করে না?

তোমার ক্ষণিকের চলে যাওয়া নিয়ে যখন
অসুখ ঘিরে ধরে,
চেয়ে দেখি,
কতো হৃদয় চলে গেছে পৃথিবী ছেড়ে,
তাদের অসুখ নেই?

শুয়ে বসে কাটানো, খেতে পাওয়া জীবনে
বারবার বিরিয়ানি চাই,
আসলে চাহিদা বেশি আমার
ভাত-ডালের জন্য লড়াই করে বেঁচে থাকা জীবন জানে জীবন কী...

চারপাশে চেয়ে দেখি,
বহু জীবন বেঁচে থাকে দারিদ্র্যে, ব্যথায়
সে দারিদ্র্য আমি দেখিনি
সে ব্যথা হয়নি কোনোদিন...
চেয়ে দেখি ওরা বেঁচে থাকে....

# টান

## ...প্রজ্ঞা

১.

রোদের কতরকম নাম হয়;
নদীর ধুলোবালিছাই জমা বুকে তাদের
জন্ম-জীবন-ক্ষয়।
আদিগন্ত সবুজের আঁচলে একটু একটু করে বেড়ে চলে
আলোর কারিকুরি, তুলির টান।
ঝরণার স্ফটিক আয়না প্রেমিকের চোখের মত নরম,
আটপ্রহরের গল্প লেখা শেষ হলেও
কোথায় কোনোদিন প্রেমিক হারিয়ে যায়নি।
অভিমানী রোদ মেঘের বালিশ ছিঁড়ে
উড়িয়ে দিয়েছে ধূসর মালভূমি জুড়ে-
সেইখানেই তার বসত হতে পারতো,
ঘর, সে ঘরে মানুষ নেই কোনো।
নতুন করে আর এক সন্ধ্যা নামে
তার নামে,
কার নামে!
রোদের কত গল্প জমা থাকে।
ঠিক ঝিনুকের নূপুর পায়ে
মরমি স্রোতের ঢেউ গুনে চলে অবিরাম,

আর বেঁচে থাকার দিন ফুরিয়ে এলে
কোন পাহাড়ের সুর হেঁটে চলে নোনাপাড় ছুঁয়ে দেখবে বলে...
আলসে ক্ষণের গায়ে ফেরার চিঠি ফেলেই চলে যাবে।
আঙুল ছোঁয়ার দিন পেরোলে
চিঠিরাও একদিন কাগজের নৌকা হবে,
একদিন... বয়ে যাবে মোহনার পথে।

জলের হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে,
আরো একটা রাতফড়িংয়ের ঘুম এনে দাও, মেঘ।

২.
মেঘ জমেছিল, আমার রোদেলা দিনের সকালে;
হঠাৎ জমা বিন্দু বিন্দু বৃষ্টিফোঁটার অল্প আলাপ
"ভালোবাসতে আর দেরী নয়"- বলছে এসে
ফিসফিসিয়ে, চিঠির খামে তার নামের এক গোলাপ এলো।
গোলাপ এলো বন্ধু হয়ে,
গোলাপ এসে কাঁধ ছুঁয়েছে,
গোলাপ, তুমি আমার জন্য কি এনেছো?
আমার জন্য আস্ত চিঠি, নরম পালক
কিংবা অনেক অনেক আগের গল্পকথা,
রাজকুমারী আজও ঘুমায়, পক্ষীরাজও পথ ভুলেছে,
আসতে এতো দেরী হল কুমার?

দুচোখ মেলে দেখতে পেলাম, চিঠির পাতায়
সব আখররা ঝাপসা হচ্ছে, মিলিয়ে যাচ্ছে,
ফুল হয়ে সব ফুটছে ওরা জুঁইয়ের ডালে,
মালা হয়ে উঠছে সেজে, হাতছানিতে গন্ধ সাজায়;
সাত রঙেরা শাড়ির মত কুঁচি দিয়ে সাজতে শিখতেই
দীঘির পাড়ে আঁচল ভিজে যায়...
দিনের শেষেও মেঘ জমেছে, দেখছি ভুলে
আমার শুধু খোঁপা বাঁধাই সার হয়েছে।

ফুল ঝরেছে নিশিপদ্মের পায়ে।

## A slow stream of rough sketches : …সৌরভ সরকার

### 1. Blind

## 2. The Jealous Woman

## 3. For a expressionless face

# অন্য পৃথিবী -

## ...নির্মাল্য সেনগুপ্ত

১)

“ দরজাটা খুলতেই অবাক হয়ে গেল দীপু। বিস্ফারিত চোখে দেখল তার বই-খাতা, ছেঁড়া কাগজ, চিপসের প্যাকেট আর ধুলোভর্তি ঘরটার দেওয়ালের পিছনেই একটা অন্য পৃথিবী। বাইরের গাড়িঘোড়া ভর্তি শহর থেকে পুরো আলাদা। প্রথমে কিছুটা জঙ্গল আর তারপরেই একটা সুদূর বিস্তৃত সমুদ্র। যার ঢেউ গিয়ে আছাড় খাচ্ছে একটা বিশাল উঁচু নীল রঙের পাহাড়ে। রঙ বেরঙের প্রজাপতি আর নাম না জানা পাখি উড়ছে আকাশে। তুলোর মত মেঘ এসে গোত্তা খেল দীপুর নাকে। সে মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে গেল আরো গভীরে। এই স্বপ্নের জগৎ ছেড়ে সে আর বাড়ি ফিরতে চায়না কোনোদিন...”

এতটা পড়ে আমি দীর্ঘশ্বাস ফেললাম। বিশু একটা খবরের কাগজ বুকের উপর ছড়িয়ে এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে সামনের দেওয়ালটার দিকে। ওর বড় বড় চুলের আড়াল থেকে চোখগুলো দেখে মনে হচ্ছে ওরও যেন ইচ্ছে করছে এমন একটা জায়গায় চলে যেতে। আমি একটু হেসে বললাম, “কিরে, ঘুরতে যাবি? চল, সামনে তিনদিন ছুটি আছে। আমি না হয় আরও দু দিন নিয়ে নেব। ঘুরে আসি কোথাও থেকে...”

বিশু দেওয়াল থেকে চোখ না সরিয়ে বলল, “আমার ঘোরা বেড়ানো সব বই এর পাতাতেই সেরে ফেলা হয়ে যায়। তবে জঙ্গল বেশ টানে আমাকে, এটা সত্যি। সে গেলে যাওয়াই যায় তবে বাবা একা থাকবে এটাই যা মুশকিল।”

আমি চিন্তিত সুরে বললাম, “হুমম, এটা সত্যি ভাবনার বিষয়। তবে জেঠুর স্বাস্থ্য তো খুব একটা খারাপ নয়, আর আমরাও সিগারেট বিড়ি খাইনা কেউ। তাই ওনাকেও যদি সাথে নিয়ে নিই...মন্দ কী? চেঞ্জে গেলে শরীর স্বাস্থ্য আরও ভাল থাকে।”

এবার বিশুর মুখে একটু অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা গেল। আমি ওর উত্তরের আশায় চেয়ে রইলাম ওর দিকে। তখনই ফোন এল একটা।

“হ্যালো, অবিনাশ? সুবিনয়বাবুর ছেলেরও হুশ ফিরেছে। তিনজনই বিপদের বাইরে এখন। সপ্তাহখানেকের মধ্যেই রিলিজ করে দেবে। গোটা ডিপার্টমেন্ট বিশ্বামিত্রের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। ওকে বোলো এবারে কিন্তু প্রেস ওকে ছাড়বেনা। সে ও যতই পালানোর চেষ্টা করুক...”

আমি ফোন রেখে বিশুর দিকে তাকিয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে বললাম, “বিক্রমদা ফোন করেছিল। সুনীলেরও হুশ ফিরেছে। অসাধারণ! বিশু, তুই জিনিয়াস! সত্যিই এবার মারাত্মক ভয় পেয়ে গেছিলাম। চাকরীর জন্য নয়। বাচ্চাগুলোর জন্য। বিক্রমদা বলছিল এবার প্রেস তোকে ছাড়বেনা।”

বিশু সভয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “ছাড়বেনা মানে? না না, প্রেস টেসের মধ্যে আমি নেই। বেশি আলো, লোকজন, শব্দ আমার ভীষণ ভয় লাগে। অবিনাশ, আমি পারবনা। তুই তো জানিস কি কষ্ট হয় আমার!”

আমি বললাম, “সে তো জানি। কিন্তু সারা শহরে তোর নাম ছড়িয়ে গিয়েছে এবারে। খবরের চ্যানেলগুলোতে সারাদিন তোর নাম করছে। সবাই একবার বিশ্বামিত্র বসু’কে চাক্ষুস দেখতে চাইছে। তাদের দাবীটাও কিন্তু অগ্রাহ্য নয়।”

বিশু হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। তারপর থেমে আমার দিকে তাকিয়ে বলল, “তোর প্রস্তাবটা মন্দ নয়। চল ঘুরে আসি। বাবাকেও বলি গিয়ে। দিন দশেক কলকাতার বাইরে যেতে হবে। ব্যাপারটা ধামাচাপা পড়ুক, তারপর ফিরে আসব চুপিচুপি...”

আমি হো হো করে হাসতে লাগলাম। অদ্ভুত ছেলেটা। কে বলবে এই রোগা, খুব বেশি হলে পয়তাল্লিশ কেজি ওজনের, আধপাগল ছেলেটা দুদিন আগে, শৈশব পেরোতে পারেনি এমন তিনটে মানুষের প্রাণ বাঁচিয়েছে এবং যাকে দেখার জন্য কলকাতার সকলে উৎসুক।

আমিও দাঁড়িয়ে পড়ে বললাম, তবে তাই হোক। আমি তবে আজই ছুটির অ্যাপ্লাই করি। তোর সৌজন্যে সেটা পেতে মুশকিলও হবেনা আশা করি...”

বিশুর মুখে এই প্রথম হাসি ফুটল। গোঁফের আড়াল থেকে ঠোঁটটা নড়ে উঠে বলল, “শুভস্য শীঘ্রম...”

বেরিয়ে পড়লাম আমি। জিপে উঠতে উঠতে ভাবতে লাগলাম আগের সপ্তাহের কথা। উফফ, কী দিনই না গেছে...

গত সপ্তাহের সোমবারঃ

আজ সকালে শ্যামবাজার পুলিশ স্টেশনে একটু ভীড় কম। সাধারণত এই সময় ডায়েরী করার লাইন পড়ে যায়। সদ্য একটা কিডন্যাপিং এর কেস এসেছে হাতে। সেটার ফাইলের পাতা উল্টাচ্ছি, এমন সময় বিক্রমদা হন্তদন্ত হয়ে ঢুকল।

আমি ফাইল থেকে চোখ না সরিয়েই জিজ্ঞেস করলাম, "কী হল? এত ব্যস্ত কেন?"

বিক্রমদা বলল, "টিভিটা খোল। খবরে দ্যাখ। ভবানীপুর বিদ্যা ভবন থেকে আরেকটি বাচ্চা নিরুদ্দেশ। লালবাজারে শোরগোল পড়ে গেছে। তিনদিন পরপর তিনটে স্কুল থেকে তিনটে বাচ্চা উধাও। অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের স্কুলে যেতে দিতে ভয় পাচ্ছে। হুহু করে ছাত্রছাত্রীর উপস্থিতির হার কমে যাচ্ছে সমস্ত স্কুলগুলোতে। অবিনাশ, একটা কেস কিন্তু আমাদের ডিপার্টমেন্টের। চাপটা বুঝতে পারছিস?"

চিন্তায় গালে হাত পড়ে গেল আমার। সত্যি অদ্ভুত বিষয়। গত পরশু শ্যামবাজারের একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল থেকে সপ্তম শ্রেণীর এক ছাত্র, স্কুলের পর উধাও হয়ে যায়। পরেরদিন সকালে তার বাবা এসে মিসিং ফাইল কেস করে। সেদিনই দমদম থানা থেকে খবর আসে একটি হিন্দী মিডিয়াম স্কুলের এক ছাত্রী নিরুদ্দেশ। আজ ভবানীপুর। অদ্ভুত বিষয় হল, অপহরণের

নিয়ম মেনে মুক্তিপণের কোনো ফোন আসেনি কারও বাড়িতে। তবে বাচ্চাগুলো যাচ্ছে কোথায়? ফোন চেক করলাম। মিডিয়া বলছে একি সেই আশির দশকের ছেলেধরা ফিরে এল আবার? কেন অপহরণ হচ্ছে শিশুরা? বিক্রীর জন্য? নাকি তন্ত্রসাধনা? কারণ যাই হোক, কলকাতা শহর ফের ছেলেধরার ভয়ে জেরবার।

আমি বিক্রমদার দিকে তাকিয়ে বললাম, "শিরে সংক্রান্তি। মাথা কাজ করছেনা বিক্রমদা। একজনের কথাই মনে আসছে।"

বিক্রমদার চোখে যেন আশার আলো ফুটল। সে বলল, "তোর সেই অঙ্কপাগল বন্ধুটির কী খবর? বিশ্বামিত্র বসু? তার কাছে গিয়ে শুয়ে পড়। বল, এবারের মত উৎরে দিতে।"

আমি চিন্তিত স্বরে বললাম, "সে খুবই মুডি লোক। তার ইচ্ছে না হলে তাকে কিছুতেই নড়াচড়া করানো যাবেনা।"

বিক্রমদা উত্তেজনায় ভুড়ি দুলিয়ে বলে উঠল, "এ কি কথা! তার কোনো দায়িত্ব নেই নাকি সমাজের প্রতি? এমন ক্রিটিকাল অবস্থা। তার মত বুদ্ধিমান লোক যদি এগিয়ে না আসে তবে চলবে কী করে?"

আমি হেসে বললাম, "তার তো এর জন্য মাসের শেষে মাইনে প্রাপ্তি হয়না বিক্রমদা। সে নিজের শখে সাহায্য করে আমাদের। নিজেও অসুস্থ বেশ।

তাছাড়া, তোমাদের তো কখনই তার পুলিশের কাজে নাক গলানো পছন্দ ছিলনা। এবার যেহেতু নিজেদের অবস্থা খারাপ, তাই তার কথা মনে পড়ছে।”

বিক্রমদা একটু থতমত খেয়ে বলল, “আরে প্রথম প্রথম তো বিশ্বাস হয়নি তার চেহারা দেখে। তবে সে ছোকরা বেশ এলেমদার লোক। পরে বুঝতে পেরেছি। শরীরের ওই দশা, তবে মাথাটি সরেস। দ্যাখ না তাকে বলে। যদি সে কিছু বুদ্ধি দিতে পারে।”

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম, “দেখি...”

সন্ধেবেলা গেলাম বিশুর বাড়ি। দরজায় কড়া নাড়তেই বিশু দরজা খুলে দিয়ে বলল, “আরে তুই? আয় আয়, আজই ভাবছিলাম তোর বাড়ি যাব। নতুন কোনও কেস আছে কী? ছোটখাট হলেও চলবে। ভাল্লাগছেনা কিচ্ছু। একটু মাথা খাটাতে চাই। বড় কিছুর সুযোগ না হলে ছোটই সই...”

ভাগ্যদেবী প্রসন্ন! আমি খুশি হয়ে বললাম, “আছে একটা কেস। সেটা নিয়ে কথা বলতেই এসেছি।”

বিশু সামনের চেয়ারটা টেনে আমায় দেখিয়ে বলল, “বস। আস্তে আস্তে বল।” অন্ধকার ঘরটা। কোণার টেবিলে সাদা রঙের ল্যাম্পের যেটুকু আলো তাতে বিশুর মুখ আবছা দেখা যাচ্ছে। আমি কেসটা শোনালাম ওকে। ওর অভিব্যক্তি বুঝতে পারলামনা।

বিশু কিছুক্ষণ ভেবে বলল, “শ্যামবাজারের স্কুলটায় তো যেতে অসুবিধে নেই। তোর আন্ডারে। কিন্তু বাকি দুটো স্কুলেও আমাকে যেতে হবে। আগে দেখতে হবে এই অপহরণগুলো কানেক্টেড কিনা। সেগুলোয় ইন্টারোগেট করতে দেবে কি আমায় বা তোকে?”
আমি ওকে আশ্বস্ত করে বললাম, “চিন্তা নেই। লালবাজারের বলরামবাবুকে বললে সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। উনি আগের কেসটার থেকেই তোকে চেনেন। মোটামুটি তোর খ্যাতি হয়েছে ডিপার্টমেন্টে। অসুবিধে হবেনা।”

বিশু এবার গম্ভীর গলায় বলল, “তবে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ শুরু করতে হবে। নইলে বাচ্চাগুলোকে বাঁচানো যাবেনা। যদি না ইতিমধ্যেই কিছু...”

আমার বুক কেঁপে উঠল। নিষ্পাপ শিশু! তাদের কি করে কেউ কষ্ট দিতে পারি, আমি এই দুই বছরের পুলিশের চাকরী সত্ত্বেও এখনও বুঝে উঠতে পারিনি...

২)
পরের দিন বিশ্বামিত্র বলল আগে তিনটে স্কুল ঘুরে দেখা হবে। তারপর যাওয়া হবে তাদের অভিভাবকদের বাড়ি। তিনজন মিসিং’এর নাম যথাক্রমে সুনীল ভট্টাচার্য্য, সুদর্শনা সাউ এবং অনুজ মিত্র। সকলেরই বয়স আট থেকে এগারোর মধ্যে। আমরা বেলা এগারোটায় পৌঁছলাম শ্যামবাজারের নেতাজী মেমোরিয়াল হাই স্কুল। আমি, বিক্রমদা, বিশ্বামিত্র এবং কন্সটেবল দিলীপ। স্কুলের সিকিউরিটি গার্ড আমাদের টিচার্স রুমে নিয়ে গেল।

সাদা চেক শার্ট, মাঝারী উচ্চতার একজন ভদ্রলোক এগিয়ে এলেন চিন্তিত মুখে। এর সঙ্গে আমি আগেও একবার দেখা করেছি। অশোক ভট্টাচার্য। এই স্কুলের প্রিন্সিপাল।
অশোকবাবু আমাদের ওনার কেবিনে নিয়ে এসে বসতে বললেন। দিলীপ বাইরে অপেক্ষা করল।

অশোকবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "ভীষণ বিপদে পড়েছি অবিনাশবাবু। ঘটনাটির পর থেকে অভিভাবকরা রেগে ফায়ার হয়ে আছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের দিকে আঙ্গুল উঠছে। এর আগে আমাদের হিস্ট্রিতে এমন কোনও কেস নেই। যেহেতু ছেলেটি স্কুল থেকে ফেরার পথেই মিসিং হয়েছে তাই দায়টা স্কুলের ঘাড়ে এসে পড়েছে। এদিকে স্কুলে প্রায় সাতশো জন ছাত্রছাত্রী। সবার দিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নজর রাখাও সম্ভব নয়। তাছাড়া, বেশিরভাগ স্টুডেন্ট স্কুলবাসে বাড়ি ফেরে। সুনীলের বাড়ি কাছে হওয়ায় সে হেঁটে বাড়ি ফিরে যায়। ফলে সে কোথায় গেছে তা আন্দাজ করাও সম্ভব নয়।"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, " ক্লাস সেভেনের ছাত্র একা বাড়ি ফেরে কেন? তার বাড়ি থেকে আসেনা কেউ নিতে?"

অশোকবাবু বললেন, "পাড়ার মধ্যেই স্কুল। মিনিট পাঁচেকের দূরত্ব এখান থেকে। সুনীলের বাবা ডাক্তার, মা ব্যাঙ্কে চাকরী করেন। তাই তারা সময় পাননা। একজন মহিলা আছে বাড়িতে, সে সকালে ছেড়ে যায় সুনীলকে। কিন্তু সে ফিরত একাই।"

এবার বিশু জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা এই সুনীলের কোনও কাছের বন্ধু ছিলনা স্কুলে? মানে যার সঙ্গে সে বেশিরভাগ সময় কাটায়?”

অশোকবাবু বললেন, “ছেলেটি খুব মুখচোরা। পড়াশুনাতেও বেশ ভাল। র্যাঙ্ক করে প্রতি বছর। তবে একটি ছেলের পাশে তাকে বসতে দেখা যেত। বলতে গেলে সেই বোধহয় তার একমাত্র কাছের বন্ধু স্কুলে।”

আমি বললাম, “তাকে একবার আনা যেতে পারে?”

অশোকবাবু কিছুক্ষণ ভাবলেন। তারপর সামনের ফোনটা তুলে বললেন, “সুদীপ্তকে ডাক তো একবার।”
মিনিট দুয়েকের মধ্যে একজন সৌম্য চেহারার ভদ্রলোক উঁকি মারলেন দরজার সামনে।
“ডাকছেন স্যর?”
অশোকবাবু ঘুরে সেইদিকে তাকিয়ে বললেন, “সুদীপ্ত, সেভেন-বি’র সেই ছেলেটা, সুনীলের বন্ধু। তাকে একবার নিয়ে আস তো।”

সুদীপ্তবাবু মাথা নেড়ে চলে গেলেন।
কিছুক্ষণ পর তাঁর হাত ধরে একটি বছর দশেকের বালক ঘরে প্রবেশ করল। শ্যামলা, চেহারা রোগার দিকে, মুখে ভয়ের ছাপ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।
বিশ্বামিত্র চেয়ার থেকে নেমে বাচ্চাটির সামনে হাঁটু গেড়ে বসে জিজ্ঞেস করল, “নাম কী তোমার?”
ছেলেটি দ্বিধাভরা গলায় উত্তর দিল, “ক্কৌস্তভ...কৌস্তভ প্রামানিক...”

বিশু খুব নরম স্বরে বলল, “আচ্ছা কৌস্তভ, তুমি আর সুনীল একসাথে খেলাধুলো করতে?”

কৌস্তভ ভয়ার্ত চোখে জোরে জোরে মাথা নাড়ল দুদিকে।

বিশু জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা সুনীল কী তোমাকে কারোর কথা বলেছিল এর মধ্যে? নতুন কোনও বন্ধুর কথা? কোথাও ঘুরতে যাওয়ার কথা? এমন কিছু যা তোমাকে আগে বলেনি?”

কৌস্তভ এবারও একইভাবে মাথা নেড়ে অশোকবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, “আমি কিছু জানিনা স্যর...আমার টয়লেট পেয়েছে...” আমার মনে হল ছেলেটি এবার কেঁদে ফেলবে।

অশোকবাবু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, “আপনারাই দেখুন অবিনাশবাবু। সবাই শিশু ওরা এখনও। এভাবে ভয়ে ভয়ে পড়াশুনা করা কী সম্ভব?”

সুদীপ্ত নামের ভদ্রলোক একবার অশোকবাবুর কাছে এসে কিছু বললেন। অশোকবাবু মাথা নাড়লেন। সুদীপ্ত কৌস্তভের হাত ধরে নিজের কাছে টেনে মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে কিছু বোঝালেন। আমি দেখলাম ছেলেটির মুখ থেকে ভয়ের রেশটা কাটল বেশ খানিকটা।

সুদীপ্ত আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “এবার আপনারা জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারেন আবার।”

বিশ্বামিত্র কৌস্তভের দিকে তাকিয়ে বলল, “তোমার ভয় পাওয়ার কিচ্ছু নেই কৌস্তভ। আমরা কেউ রাগী শিক্ষক নই। তোমার দাদার মত। আচ্ছা আমরা কিচ্ছু জিজ্ঞেস করছিনা, তুমি যদি কিছু জান তবে নিজেই বলে দাও। তারপর আর বিরক্ত করবনা তোমাকে।”

এবার কৌস্তভ বেশ কিছুটা স্বাভাবিক গলায় বলল, “কিছুই আলাদা তেমন দেখিনি। আমি তো স্কুলবাসে ফিরি, ও সেদিনও হেঁটে বাড়ি চলে গেল অন্যদিনের মতন। ক্লাসেও একরকমই ছিল। শুধু কয়েকদিন আগে আমাকে একটা জায়গার কথা বলেছিল। কি যেন একটা জায়গা, নাম মনে নেই। একটা নীল রঙের পাহাড়, সমুদ্র, জঙ্গল...মনে নেই ঠিক করে। আর আর...”

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “আর কী?”

কৌস্তভ একবার সবার দিকে তাকাল। তারপর ঢোক গিলে বলল, “সপ্তাহখানেক আগে আমাদের জিওগ্রাফি স্যর পড়া না পারায় সুনীলকে মেরেছিল খুব।”

বিশু কিছুক্ষণ চিন্তা করে বলল, “ঠিক আছে। তুমি আসতে পার।”

কৌস্তভ সুদীপ্তবাবুর হাত ধরে চলে গেল।

আমি অশোকবাবুর দিকে ঘুরে বললাম, “এই কথাটা তো বলেননি আমায় আগে?”

অশোকবাবু থতমত খেয়ে বললেন, “আসলে চঞ্চল একটু বেপরোয়া প্রকৃতির। এই বিষয়ে আমি ওকে বেশ তিরস্কারও করি। ইনফ্যাক্ট ওকে রেজিগনেশনও দিতে বলেছি এই মাসের মধ্যে।”

বিশুর চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। আমি গম্ভীর গলায় বললাম, “এই ইনফরমেশনটা আপনাদের আগে দেওয়া উচিত ছিল অশোকবাবু। আমি একবার চঞ্চলবাবুর সাথে দেখা করতে চাই।”

অশোকবাবু রিসিভারটা তুলে চঞ্চলবাবুকে ডেকে পাঠালেন।

কিছুক্ষণ পর একজন ঢ্যাঙ্গা, কালো রঙের ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন।

আমি তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম, “নাম?”

লোকটি একবার সবার মুখের দিকে তাকিয়ে দৃঢ় গলায় বলল, “চঞ্চল বসু।”

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “সুনীলের অন্তর্ধান নিয়ে আপনার কাউকে সন্দেহ হয়?”
চঞ্চল বসু একইরকম গলায় বলে উঠলেন, “আমি এখানে পড়াতে আসি। সন্দেহ করতে নয়।”

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “সপ্তাহখানেক আগে আপনি সুনীলের গায়ে হাত তোলেন?”
চঞ্চল বসু বললেন, “পড়া না পারলে ছাত্রদের শাস্তি দিতেই হয়। শুধু ওই ছেলেটি কেন, অনেককেই অনেকরকম শাস্তি দিয়েছি।”
আমি এবার সামান্য কড়া গলায় বললাম, “কিন্তু কাউকে শাস্তি দেওয়ার জন্য যদি চাকরি চলে যায় তবে তার উপর ব্যক্তিগত রাগ এসে পড়তেই পারে, তাই নয় কি?”
চঞ্চল বসু এবার সামান্য হেসে বললেন, “চাকরি আমি নিজে ছাড়ছি ইন্সপেক্টর। আমি একটি নামী স্কুলে চাকরি পেয়ে গেছি। পরের মাসে সেখানে জয়েনিং। পাঁচ মিনিটের মধ্যে একটা ক্লাস আছে। আসতে পারি?”
আমি মাথা নাড়লাম। চঞ্চল বসু বেরিয়ে গেলেন। ঘরে সুদীপ্তবাবু প্রবেশ করলেন।
আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, “আজ তাহলে আসি। আপনারা কোনও ইনফরমেশন জানাবেন পুলিশকে।”
বেরনোর সময় আমি সুদীপ্তবাবুর দিকে হাত বাড়িয়ে বললাম, “ধন্যবাদ আপনাকে। আপনাকে ছাত্রছাত্রীরা বেশ পছন্দ করে তাই না?”

সুদীপ্ত আমার হাতটা ধরে ঝাঁকিয়ে মাথা নেড়ে বললেন, “আমি বাচ্চাদের খুবই ভালবাসি।”

অশোকবাবু কিছুটা গর্বের সাথে বললেন, “সুদীপ্ত বাচ্চাদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে লন্ডনে পড়াশুনা করেছে। ও চাইলে আপনাদের সাহায্য করতে পারে এই বিষয়ে।”

আমি সুদীপ্তবাবুর দিকে তাকিয়ে বললাম, “আপনার সাহায্যের প্রয়োজন হতে পারে সুদীপ্তবাবু। যদি সুনীলের কোনও বন্ধুর থেকে কোনও ইনফরমেশন জোগাড় করতে পারেন তবে খুব সুবিধে হবে আমাদের। বুঝতেই পারছেন, এমন নিষ্পাপ শিশুদের যারা ক্ষতি করতে চায় তারা কতটা খারাপ। তাই আমাদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কিছু করতে হবে...”

সুদীপ্তবাবু মাথা নীচু করে অল্প হেসে বললেন, “সাত বছর আগে আমার একমাত্র মা-মরা ছেলে মারা যায় ইন্সপেক্টর। তারপর থেকে বাচ্চাদের নিয়েই আছি। ওদের ভালর জন্য আমি সবকিছু করতে পারি। চিন্তা নেই। আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি, যদি কিছু জানা যায়...”

বিশুও সুদীপ্তর দিকে তাকিয়ে বলল, “আপনার পরে প্রয়োজন হতে পারে আমার। খবর পাঠাব, আজ চলি।”

সুদীপ্ত মাথা নাড়লেন। আমরা বেরিয়ে পড়লাম।

গেটের বাইরে আসার পর বিশু আমায় বলল, “একটা ইনফরমেশন জোগাড় করতে হবে বুঝলি...”

“কী?”

“চঞ্চল বসু কোন স্কুলে চাকরি পেয়েছে...”

৩)

আমরা এবার রওনা দিলাম দমদম গোরাবাজারের দিকে। স্কুলের নাম আদর্শ বিদ্যাপীঠ।

বিক্রমদা আমাকে বললেন, “অবিনাশ, সমস্ত কিডন্যাপিং র্যাকেটগুলোকে চেস করা শুরু হয়ে গেছে। এখনও অব্ধি আঠারোটা অ্যারেস্ট হয়ে গেছে। কিন্তু তারা কেউই ইনভলভড নয় বলছে। তুমি যদি তাদের জেরা করতে চাও...”

আমি বিশুর দিকে তাকালাম। তার মুখ দেখে মনে হল তার তেমন উৎসাহ নেই।
আমি বললাম, “আগে স্কুলগুলো যাওয়া যাক। তারপর তাদের অভিভাবকদের কাছে। এগুলো মিটলে দেখা যাবে।”

পয়তাল্লিশ মিনিট পর আমরা পৌঁছলাম আদর্শ বিদ্যাপীঠে। স্কুলের সামনে একটা বড় মাঠ যার লাগোয়া প্রচুর ছোট ছোট স্টল। আচার, লজেন্স, খেলনা, ফুচকার দোকান, আইসক্রীমের গাড়ি ইত্যাদি। আমরা সোজা গেলাম টীচার্স রুমের দিকে।
এই স্কুলের হেডস্যার, বিনায়ক শ্রীবাস্তব এগিয়ে এলেন আমাদের দিকে। অবাঙ্গালী ভদ্রলোক, ঠোঁটের উপর একটি পুরুষ্ঠ গোঁফ শোভা পাচ্ছে।

“এই তো কাল পুলিশ এল। আজ আবার আপনারা। অ্যায়সে কেইসে চলেগা বোলিয়ে তো...”

বিক্রমদা বললেন, “স্পেশাল অর্ডার হেডুবাবু। চলুন, চলুন, বসা যাক।”

বিয়ানক শ্রীবাস্তবকে বেশ অপ্রসন্ন মনে হল। আমরা একটা টেবিলের সামনে বসলাম। বসতেই বুঝলাম, চেয়ারটা আধভাঙ্গা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “শ্রীবাস্তবজী, আপনাদের স্কুলে মোট কতজন ছাত্রছাত্রী আর কতজন টিচার আছে?”

শ্রীবাস্তব একটু ভেবে বললেন, “লগভগ বারাশো স্টুডেন্ট আছে। টিচার আছে চালিশের মত। আদার স্টাফ আছে তের জন।”

বিক্রমদা বললেন, “এই সুদর্শনা নামের মেয়েটিকে আপনি চিনতেন?”

শ্রীবাস্তব ঘাড় নেড়ে বললেন, “জী, চিনতাম...”

বিশু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, “চিনতেন? বারশো ছাত্রছাত্রীর মধ্যে একজনকে চিনলেন কি করে?”

শ্রীবাস্তবজী একটু গম্ভীর হয়ে বললেন, “কিউকি ওই লাড়কীর ফাদার খুব খারাপ মানুষ। ফিস না দেওয়ায় একবার কল করা হয়েছিল। সে এসে চেচামেচি করল ভীষণ। বলল, স্কুলের হিসাবে গড়বড় আছে। আমাদের এক স্টাফ তার হাত ধরে বের করার কোশিশ করলে ঘুসা মেরে তার নাক ভেঙ্গে দিল।”

আমি চমকিত হয়ে বললাম, “আপনারা এক্সপেল করেননি ছাত্রীটিকে?”

শ্রীবাস্তব হাত উলটে বলল, “বাচ্চিটির এতে কী দোষ বলুন। আমরা টিচাররাই ঠিক করলাম যে ওকে নিকালবোনা। তবে আমি পার্সোনালি ডায়রী করতে চেয়েছিলাম ওর বাবার নামে। সেই স্টাফটি বলল দরকার নেই, সে নিজে বুঝে নেবে।”

আমি বললাম, “সেই স্টাফটি কোথায়?”
শ্রীবাস্তব একটু ভেবে বললেন, “সে তো পাঁচদিন ধরে স্কুলে আসছেনা। লিভ নিয়েছে। তার বুখার হয়েছে।”
বিক্রমদা বললেন, “এই স্টাফের নাম, ঠিকানা একটু লিখে দেবেন।”
শ্রীবাস্তব মাথা নেড়ে একটা রেজিস্টার খুলে বসলেন। তারপর একটা কাগজে লিখে এগিয়ে দিলেন আমার দিকে। আমি দেখলাম, নাম বিলাস পাসোয়ান, ঠিকানার লোকেশনটা চিনতে পারলামনা।
আমি জিজ্ঞেস করলাম, “এই মেয়েটির কাছের কোনও বন্ধু ছিল?”
শ্রীবাস্তব মাথা নেড়ে বললেন, “হা পাঁচ, ছজন ছিল। আগেও পুলিশকে তারা বয়ান দিয়েছে। ডাকব তাদের?”

আমি মাথা নাড়লাম। কিছুক্ষণ পর একজন স্টাফ চারজনকে নিয়ে এল আমাদের কাছে। এদের মধ্যে তিনজন মেয়ে, একজন ছেলে। বিশু তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করল আগেরবারের মতই। কেউই বিশেষ কিছু বলতে পারলনা। শুধু একজন বলল, মেয়েটির বাবা খুব রাগী। সে বাড়িতে প্রায়শই মার খেত। টিফিনে ফুচকা খেত স্কুলের সামনে। স্কুল শেষ হলে ভ্যানে করে বাড়ি চলে যেত। অচেনা কারোর সাথে তাকে দেখা যায়নি।

আমরা বেরিয়ে গেলাম স্কুল থেকে।

বিশু বাইরে এসে হেঁটে এগিয়ে গেল সামনে। আমি দেখলাম, একটি ফুচকার গাড়ির দিকে সে এগিয়ে যাচ্ছে। আমি তার পিছু নিলাম।

ছোট্ট একটা ফুচকার গাড়ি। তাতে হিন্দীতে কিছু লেখা। আমার হিন্দীর স্বল্পজ্ঞানে বুঝলাম তাতে লেখা আছে, 'যেকোনও অনুষ্টানে ভাড়া দেওয়া হয়।' তার নিচে হিন্দীতেই কন্ট্যাক্ট নম্বর লেখা।

বিশু ফুচকাওয়ালাটির কাছে গিয়ে দশ টাকার ফুচকা চাইল। আমাকে ইশারা করায় আমিও একটা পাতা তুলে নিলাম হাতে।

"আপকা নাম ক্যা হেয় ভাইসাব?"
ফুচকাওয়ালাটি আমার পুলিশের উর্দী দেখে একটু ঘাবড়ে গেছিল। সে বিশুর দিকে তাকিয়ে বলল, "নারায়ণ।"
বিশু একটা ফুচকা মুখে পুরে বলল, "এক লাড়কী গায়েব হো গয়া স্কুল সে জানতে হেয়?"
নারায়ণ মাথা নেড়ে বলল, "হাঁ আয়সাহি কুছ শুনা। পুলিশলোগ আ রহে হেয়। মিলা উয়ো?"
"মিল যায়গী। আপ পহেচানতে থে উসে?"
"নেহী নেহী।"
আমার কাছে সুদর্শণার ফটো ছিল। সেটা দেখিয়ে বললাম, "ঠিক সে দেখিয়ে তো..."
"নেহী নেহী, ইয়াদ নেহী..."
"ঠিক হেয়। ইয়ে লিজিয়ে..." বিশু টাকা মিটিয়ে এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে। আমি ওর পাশে হাঁটছিলাম। বিশু আমার দিকে না তাকিয়েই বলল, "ডাঁহা মিথ্যে কথা বলছে। বিলক্ষণ চিনতে পেরেছে..."

অনেকগুলো চরিত্র ঘুরছিল আমার মাথার মধ্যে। জিপে উঠে আমরা রওনা দিলাম পরের স্কুলের দিকে।

ভবানীপুর বিদ্যাভবন থেকে আরও কম ইনফরমেশন পাওয়া গেল। নামকরা সরকারী স্কুল। স্কুলের প্রিন্সিপাল জ্যোতিপ্রিয় সেন ভয়ানক ব্যস্ত মানুষ। আমরা আসার পর থেকেই তিনি যেন আরও বেশি উশখুস করতে আরম্ভ করলেন। এই স্কুল থেকে মিসিং ছাত্র অনুজ মিত্রের সমন্ধে তিনি কিছুই জানেননা। তার কাছের বন্ধু হিসেবেও কোনও ছাত্র দাবী করেনি। আমরা ক্লাসে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে চাওয়ায় তিনি স্পষ্ট 'না' করে দিলেন। বললেন, "ইতিমধ্যে ভবানীপুর থানার ইন্সপেক্টর অমল বাগচী একবার জিজ্ঞাসাবাদ করে কিছু জানতে পারেননি। আর তিনি কোনোমতেই স্টুডেন্টদের উত্ত্যক্ত করতে দেবেননা।

আমি বাইরে এসে বিশুকে জিজ্ঞেস করলাম, "এবার?"
বিশু নীর্লিপ্তভাবে বলল, "চিন্তা নেই। স্কুলগুলো থেকে যা জানার ছিল জেনে নিয়েছি। তুই একটু তোর থানায় খবর দে বিলাস পাসোয়ানের খোঁজ করতে। আমরা ততক্ষণ তিনটে ফ্যামিলির কাছে যাই।"

৪)
প্রথম আমরা পৌঁছলাম যাদবপুরে, অনুজের বাবা বিজন মিত্রের বাড়ি। বাড়িটা যেন শোকের ছায়ায় থমথম করছে।

আমরা বসার ঘরের সোফায় বসলাম। বিজনবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “আমার স্ত্রী খুব অসুস্থ। আপনারা একটু অপেক্ষা করলে চা নিয়ে আসতে পারি।”

আমি হাত নেড়ে বললাম, “কোনও দরকার নেই। আমরা বেশি সময় নেবনা। কয়েকটা প্রশ্ন করেই চলে যাব।”

বিজনবাবু ঘাড় নাড়লেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, “আপনার কোনও শত্রু আছে, মানে যে আপনার ক্ষতি করতে চায়?”

বিজনবাবু অবাক হয়ে বললেন, “আমি একজন সরকারী কর্মচারী। হেড ক্লার্ক। অফিসে কারও সাতে পাঁচে থাকিনা। অফিস থেকে ফিরে পাড়ার একটা ক্লাবে তাস খেলি। তারপর বাড়ি ফিরে আসি। ক্লাবে খেলা নিয়ে মাঝে মাঝে অল্প কথা কাটাকাটি হয়েছে বটে, তবে তার জন্য আমার ছেলেকে কেউ কিডন্যাপ করবে তা কল্পনাতীত।”
আমি বললাম, “তাও যদি কারোর নাম মনে আসে?”

বিজনবাবু একটু ইতস্তত করে বললেন, “মানে ব্যাপারটা হল...ক্লাবে তাস খেলা সামান্য কিছু টাকাপয়সা দিয়ে হয়। একদমই কম। খেলার উত্তেজনা বাড়ানোর জন্য। মাসখানেক আগে স্বপন মাইতি নামে একজন সদস্যের সঙ্গে আমার ঝামেলা হয়েছিল। আমারই পার্টনার ছিল স্বপন, স্বপন গুপ্ত। এরপরে আরেকদিন সে রেগে আমার গায়ে হাত তোলার চেষ্টা করে। তার জন্য ক্লাব

থেকে তাকে বের করে দেওয়া হয়। এছাড়া কিছুই তেমন উল্লেখযোগ্য ঘটেনি।”

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “পুরনো কোনও ঘটনা? এমন কিছু যার প্রতিশোধ কেউ নিতে পারে?”

বিজনবাবু দুদিকে মাথা নাড়লেন।

বিশ্বামিত্র বিজনবাবুকে জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা বিজনবাবু, অনুজ কী গল্পের বই পড়ত? বা বাড়ির কেউ গল্প বলে শোনাত ওকে?”
বিজনবাবু বললেন, “না অনুজ গল্পের বই তেমন পড়তনা। তবে পড়লে আশ্চর্য হবনা। বাড়িতে প্রচুর বই। আমার বাবা ঁসুজন মিত্র নিজে একজন সাহিত্যিক ছিলেন। বছর দুয়েক আগে তিনি মারা গেছেন। কেন বলুন তো?”
বিশু বলল, “আচ্ছা আপনার বাবার কোনও বই প্রকাশিত হয়েছিল?”
“হ্যাঁ, সাতটি বই আছে বাবার। সবই শিশু সাহিত্য।”
বিশুর ঠোঁটের কোণায় সামান্য প্রসন্নতা লক্ষ্য করলাম। সে বলল, “সেগুলো আপনার কাছে আছে?”
“হ্যাঁ।”
“সেগুলো একটু লাগবে। এনে দিন।”
মিনিট পাঁচেকের পর বিজনবাবু কয়েকটি বই এনে হাতে দিলেন বিশ্বামিত্রর। সে বইগুলো নিয়ে জিজ্ঞেস করল, “স্বপনবাবুর বাড়িটা কোথায়?”
বিজনবাবু বললেন, “এই তো সামনের মোড় থেকে থেকে চারটে বাড়ি পর।”

“ধন্যবাদ। আজ আসি। বইগুলো রইল আমার কাছে। পরশু ফেরত দেব। আশা করি সেদিন অনুজও বাড়ি ফিরে আসবে।”

আমি অবাক হয়ে তাকালাম বিশুর দিকে। বিজনবাবুর বাড়ি থেকে বেরনোর পর ওকে জিজ্ঞেস করলাম, “কিছু ক্লিয়ার হয়েছে তোর কাছে?”

বিশু মাথা নেড়ে বলল, “না...”

“তবে যে বললি পরশু অনুজ ফিরে আসবে?”

“হ্যাঁ, তা আসবে...”

আমি আর কথা বাড়ালামনা। জিপে উঠলাম।

স্বপন গুপ্তর বাড়ি গিয়ে জানতে পারলাম সে বাড়ি নেই। পাশের বাড়ি থেকে জানা গেল, সে স্ত্রী-পুত্র সমেত দার্জিলিং ঘুরতে গেছে পাঁচ দিন আগে।

এরপর আমরা পৌঁছলাম শ্যামবাজারে, সুনীলের বাড়ি। ডক্টর সুবিনয় ভট্টাচার্য্যের বাড়ি। আমাদের দশ মিনিট অপেক্ষা করতে হল ঘরে। ডাক্তারবাবু ঘরের লাগোয়া চেম্বারে পেশেন্ট দেখছিলেন। কিছুক্ষণ পরে এলেন তিনি। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী, শিপ্রা ভট্টাচার্য্য।

পরিচয়পর্বের পর আমি বললাম, “বেশি সময় নেবনা ডাক্তারবাবু। প্রথমেই জিজ্ঞাসা করি, আপনার শত্রু আছে কোনও?”

ডঃ ভট্টাচার্য্য গম্ভীরভাবে বললেন, “ডাক্তারের তেমন কেউ বন্ধু ভাবেনা অবিনাশবাবু। রোগ সেরে গেলে তা হয় ডাক্তারের কর্তব্য, আর না সারাতে পারলেই তাকে শত্রু বলে গণ্য করা হয়।”

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “আপনি কাউকে সন্দেহ করেন?”

“না। তেমনভাবে ঘনিষ্ট বন্ধু বা শত্রু কিছুই নেই আমার। পরিবারকেই ঠিকমত সময় দিতে পারিনা। এসব বিষয় ভাবব কখন?”

আমি ওনার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললাম, “আর আপনার?”

শিপ্রাদেবীর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছিল খুব। বুঝলাম ছেলে হারিয়ে যাওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই প্রচণ্ড ভেঙ্গে পড়েছেন তিনি। মাথা নাড়িয়ে তিনিও না বললেন।

এবার বিশ্বামিত্র জিজ্ঞেস করল, “আচ্ছা ডাক্তারবাবু, কিছু মনে করবেননা, আপনার চিকিৎসাধীন অবস্থায় নিরাময় না হওয়ার ফলে মারা গেছে যারা, তাদের রেকর্ড আছে আপনার কাছে?”

সুবিনয়বাবু একটু বিস্মিত হয়ে বললেন, “পনের বছর ধরে ডাক্তারী করছি। আজ অবধি প্রায় পাঁচশো পেশেন্ট মারা গেছে কারণ আমার কিছু করার ছিলনা। রেকর্ড তো নিশ্চয়ই আছে কিন্তু এতগুলো লোকের মধ্যে কে আমার ছেলেকে কিডন্যাপ করেছে আপনারা বের করবেন কি করে?”

বিশু মাথা নেড়ে বলল, “তাও ঠিক। আচ্ছা সুনীল কী গল্পের বই পড়ত? বা বাড়ির কেউ গল্প শোনাত ওকে?”

সুবিনয়বাবু আবার অবাক হয়ে বললেন, “না, সুনীল খুবই মনযোগী ছেলে। স্কুলের পরও সে পড়াশুনা নিয়েই থাকে। গল্পের বই পড়া বা টিভি দেখার মত বদভ্যেস তার নেই।”

আমি আড়চোখে তাকালাম বিশুর দিকে। গল্পের বই পড়াকে বদভ্যেস বলায় তার অভিব্যক্তি বোঝার জন্য।

বিশু একইরকম গলায় বলল, “একবার আপনাদের বাড়ির কাজের লোকটিকে ডাকা যায়?”

শিপ্রাদেবী এবার একটু উঠে ডাক দিল, “রিনা...”

একটি বাইশ তেইশ বছরের রোগা মেয়ে এল আমাদের সামনে।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, “স্কুলে যাওয়ার পথে আপনি কাউকে দেখেছেন সুনীলের সাথে কথা বলতে?”

রিনা মাথা নাড়িয়ে বলল, “কই না তো!”
“সুনীলের সঙ্গে কথা হয় আপনার?”

রিনা মাথা নাড়াল।

বিশু উঠে দাঁড়িয়ে বলল, “আজ আসি। প্রয়োজনে যোগাযোগ করব। আশা করি দুদিনের মধ্যেই আপনার ছেলে বাড়ি ফিরে আসবে।”

সুবিনয় ভট্টাচার্য্যের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার মনে হলনা তিনি খুব একটা আশাবাদী হলেন বিশ্বামিত্রের কথায়। আমরা দরজার দিকে এগোচ্ছিলাম। পিছন থেকে শিপ্রাদেবীর ডাক এল।

“একটু শুনবেন?”
বিশু ঘুরে বলল, “বলুন...”

শিপ্রা ভট্টাচার্য্য বিশুর সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলেন এক মুহুর্ত। তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে বললেন, “চারদিন হয়ে গেল। ছেলেটা খেয়েছে তো কিছু? ওরা মারবেনা তো ওকে?”

আমি ডাক্তারবাবুর দিকে তাকালাম। তাঁর গম্ভীর শক্ত মুখ হলেও চোখের অবস্থা ভাল নয় বোঝা যাচ্ছিল।

আমরা বেরিয়ে গেলাম বাড়ি থেকে।

এরপর আমরা পৌঁছলাম দমদমের আর. এন. গুহ রোড। সুদর্শনা সাউ এর বাড়ি। তার বাবা কিশোর সাউ ট্যাক্সিচালক। তাকে ফোন করে বাড়িতে ডাকা হল। পনের মিনিট পর সে পৌঁছল বাড়িতে। তার স্ত্রী আমাদের ছাতুর সরবত দিতে চেয়েছিল, আমরা মানা করেছি।

কিশোর ঘরে ঢুকেই তার বউ এর দিকে রক্তদৃষ্টি হেনে বলল, “তু ইয়াহা ক্যা কর রেহি হেয়? অন্দর যা...”

তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলায় বলল, “দেখুন আপনারা রোজ রোজ এমন বেবসার টাইমে এলে কি করে চলবে? এক তো আমার বেটিকে ঢুঁততে পারলেননা এখনো। শুনে রাখুন, আমার বাচ্চি আমার চাই। যেমন করে হোক।”

আমি বললাম, “তোমার মেয়েকে তুমি পেয়ে যাবে। তার আগে বল, তুমি তোমার মেয়ের স্কুলের দারোয়ান বিলাস পাসোয়ানকে মেরেছিলে?”

কিশোর একটু ভাবল। তারপর তাচ্ছিল্যের স্বরে বলল, “হাঁ, সে ব্যাটা বেগরবাই করছিল। কলার পাকড়েছিল আমার। মেরে শুইয়ে দিয়েছি। সালা, স্কুলের সব হারামিলোগ, পয়সা দিয়েছি তাও বলছে কিনা দিইনি। ”

আমি বললাম, “তোমার কোনও শত্রু আছে? মানে দুশমন আছে কেউ?”

কিশোর আবার রক্তচক্ষু দেখিয়ে বলল, “দুশমনকে আমি ডরাইনা সাব। মেরে শুইয়ে দেব সবকটাকে। আর আমার বাচ্চিকে যে নিয়েছে...”

নোংরা একটা গালাগাল দিল কিশোর। বিক্রমদা রেগে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, আমি তাকে আটকালাম। বললাম, “সন্দেহ হয় কাউকে?”

কিশোর দাঁতে দাঁত চিবিয়ে বলল, “ওসব জানিনা আমি। আমার বাচ্চি আমার চাই...”

আমি উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, “তোমার বাচ্চি তুমি পেয়ে যাবে। বিশু তুই কিছু জিজ্ঞেস করবি?”

বিশু মাথা নাড়াল। আমরা দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমি ঘুরে দাঁড়িয়ে রগ শক্ত করে বললাম, “এরপর যদি কোনওদিন শুনি তুমি কোনোদিন কারোর গায়ে হাত তুলেছ, সোজা তুলে থানায় নিয়ে যাব। দেখব কে কাকে মেরে শুইয়ে দিতে পারে।”

রাত প্রায় নটা বেজে গেছিল। বিক্রমদা আমায় ডেকে বললেন, “থানা থেকে ফোন এসেছিল। সুদর্শনার স্কুলের দারোয়ান বিলাস পাসোয়ানকে পাওয়া গেছে। তার সত্যিই জ্বর। সে বাড়িতে শুইয়ে কোঁকাচ্ছে। আর চঞ্চলবাবুর খবরটাও নেওয়া হয়েছে। সে নতুন চাকরি কোথায় পেয়েছে জান? ভবানীপুর বিদ্যাভবনে...

৬)

পরেরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে সোজা গেলাম বিশুর বাড়ি। দেখি সে অনুজের ঠাকুর্দার গল্পের বইগুলো নিয়ে মেতে আছে। আমি বললাম,

“লালবাজার যাব একবার। আরও পাঁচজনকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে কাল। যাবি তুই?”

বিশু মাথা নেড়ে বলল, “নাহ্। গল্পগুলো বেশ ভাল লিখতেন ভদ্রলোক। অনেকদিন পর শিশু সাহিত্য পড়লাম। শোন আজ সাতটার সময় ফোন করব তোকে। রেডি থাকিস।”

আমি জিজ্ঞেস করলাম “কেন?”

বিশু রহস্যজনক হাসি হেসে বলল, “যদি আমার সন্দেহ সত্যি হয়, ভিক্টিম নিজের হাতে ধরা দেবে।”

আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম, “কে?”

বিশু আবার বই পড়তে শুরু করল। আমি আর কথা না বাড়িয়ে এগিয়ে গেলাম।

লালবাজারে পৌঁছে খুব একটা লাভ হলনা। ইতিমধ্যে সবাইকে থার্ড ডিগ্রি দেওয়া হয়ে গেছে। কেউই কিছু জানেনা। আমার মন পড়েছিল বিশুর ফোনের অপেক্ষায়। ছ’টা একান্নতে একটা অচেনা নম্বর ফোন এল।

“হ্যালো অবিনাশ, নাগেরবাজারের মতিঝিল চিনিস?”

“না, তুই কোথায়?”

“শোন, একটা ট্যাক্সি নে। পুলিশের জিপ নিবিনা। একা আসবি। মতিঝিলে নামবি। আমি ওয়েট করছি। কুইক...”

আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম।

ঘন্টাখানেক পর মতিঝিলে পৌঁছলাম। ভাড়া মিটিয়ে দিয়েই দেখি বিশু আমার দিকে এগিয়ে এল। হাতে একটা কোল্ড ড্রিঙ্কের বোতল।

“ঠিক টাইমে এসেছিস। চল...”

মিনিট পাঁচেক পর আমরা একটা ঝিলের সামনে এসে পৌঁছলাম। ঘুটঘুটে অন্ধকার। একটা ভাঙ্গাচোরা মন্দিরের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছি। মশায় পা ছেঁকে ধরেছে। কিছুই বুঝতে পারছিনা। লোকশূণ্য অঞ্চল। কিছু যে জিজ্ঞেস করব তারও উপায় নেই। বিশু টুঁ শব্দ করতে বারণ করে দিয়েছে।

কিছুক্ষণ পর দেখি অল্প দূরে, আস্তাকুঁড়ের সামনে একটা ছায়ামূর্তি ঘোরাফেরা করছে। এদিক ওদিক তাকিয়ে সে সামনের দিকে হাঁটা দিল।

বিশু ফিসফিস করে বলল, “অবিনাশ, এসে গেছে। ধর ব্যাটাকে।”

আমি ছিটকে বেরোলাম রাস্তায়। দৌড় শুরু করে চেঁচিয়ে বললাম, “পুলিশ... হল্ট। নড়লেই গুলি চালাব...”

ছায়ামূর্তি একটু দৌড়নোর চেষ্টা করে থেমে দাঁড়াল দু হাত তুলে। আমি সোজা গিয়ে তার কলার ধরে বসিয়ে দিলাম। তাঁর ঘাড়ে রিভলভারের নিলটা ঠেকিয়ে বললাম, “বিশু, ধরে ফেলেছি, চলে আয়...”

বিশু এসে দাঁড়াল আমার পাশে। লোকটাকে ঘুরিয়ে মুখে মোবাইলের আলো ফেলতেই অবাক হয়ে গেলাম। নারায়ণ, সেই ফুচকাওয়ালা। আদর্শ বিদ্যাপীঠের বাইরে যার স্টল।

নারায়ণ হাত জোর করে কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, “হাম কুছ নেহী জানতে সাব... কোই ফোন কিয়াথা... মহাবীরজী কি সগন্ধ, হামকো কুছ নেহী মালুম...”

বিশু নারায়ণের দিকে তাকিয়ে বলল, “কাম কেয়া থা আপকা নারায়ণজী? সচ সচ বোলো... কুছ নেহি হোগা...”

নারায়ণ চুপ করে ভাবছিল। আমি ওর কপালে রিভলভার ঠেকিয়ে বললাম, “সচ বোলেগা? ইয়া ফির ইয়েহি ঠোক দু?”

নারায়ণ এবার হাউ মাউ করে বলল, “একঠো সাব আয়াথা দুকান পে। এক প্যাকিট ছোড় গয়া। ফির ফোন করে বলল, উস প্যাকিটমে এক লাড়কির ছবি

আছে। অর কুছ কাগজ আছে। উস লাড়কি কো রোজ একটা করে কাগজ দিতে হবে। তবে দুদিন পর আমায় পয়সা দেবে। বাস অর কুছ নেহি জানতা...”

আমি বললাম, “দিয়েছিল টাকা?”

নারায়ণ ঘাড় নেড়ে বলল, “দো দিন বাদ শ্যামনগর কা এক পার্ক মে লিফাফা ছোড় গয়া থা। পাঁচশ রুপিয়া। ফোন পে বোলা থা, বাকি পয়সা সব কাগজ দে দেনে কে বাদ। লেকিন উয়ো লাড়কি তো গায়েব হো গয়ি। ফির ফোন আয়া বাকি কাগজ অর ফোটো জ্বালা দেনে কে লিয়ে। মেয়নে ওহি কিয়া। আজ দুপহর মে অর এক ফোন আয়া। বোলা নয়া কাম হেয়। ইয়াহা আনে কো বোলা। উসি লিয়ে...”

আমি জিজ্ঞেস করলাম, “চেহারা মনে আছে? কে ছিল?”

নারায়ণ কাঁদ কাঁদ গলায় বলল, “হামনে তো উসে দেখা হি নেহি সাব। পহলেদিন যব প্যাকিট ছোড় কে গয়া থা, তব ভি ঠিক সে নেহি দেখা থা। ফোন ভি অলগ অলগ নম্বর থেকে আসত।”

আমি বললাম, “ফোন নাম্বারটা কই?”

নারায়ণ নিজের ফোন থেকে কল লিস্ট দেখল। তারপর আজকের ফোন নম্বর আর আগের যে দুটো নম্বর থেকে ফোন এসেছিল সে দুটো দিল আমায়।

বিশু জিজ্ঞেস করল, “কাগজে কী কিছু লেখা ছিল?”

নারায়ণ একটু ভেবে বলল, “হিন্দীমে কুছ থা সাব। কুছ পাহাড়, সমুন্দর, আয়সা কুছ। ইয়াদ নেহী।”

বিশুর দিকে তাকালাম। সে ইশারায় বলল ছেড়ে দিতে।

নারায়ণকে ছাড়তেই সে নিমেষে উধাও হয়ে গেল। তাকে বলে রাখলাম যদি আর কোনও ফোন আসে জানাতে আমাকে। আমার নম্বর দিয়ে দিলাম তাকে।

বিশুর দিকে তাকিয়ে বললাম, “এবার?”

বিশু কিছু বললনা। আমি নম্বরগুলোতে ফোন করতে যাচ্ছিলাম। সে বলল, “লাভ নেই, আজকের নম্বরটা আমার, মোড়ের এস.টি.ডি বুথ থেকে করা। বাকিদুটোও তাই হবে।”
আমি করে দেখলাম। বিশু আন্দাজ সত্যি। একটা গড়িয়াহাটের এস.টি.ডি বুথ। অন্যটা বারাসাতের।

বড় রাস্তায় এসে ট্যাক্সি ধরলাম আমি। বিশু চোখ বুজে রইল বাকি রাস্তা। আমি ঘাঁটালামনা।

বিশুর বাড়ির সামনে ট্যাক্সিটা দাঁড়াতে সে আমায় বলল, “তোর কাছে ডঃ সুবিনয় ভট্টাচার্য্যের নম্বরটা আছে? বের করে দে তো সেটা। আর তোর

ফোনটা রেখে যা আমার কাছে। পনের মিনিটের মধ্যে বাড়ি গিয়ে ফ্রেশ হয়ে আয়।”

আমি বুঝতে পারছিলাম, কিছু একটা হতে চলেছে। আশার আলো দেখতে পাচ্ছিলাম যেন বিশুর মুখে।

তেরো মিনিটের মধ্যে আমি বিশুর বাড়িতে চলে এলাম। ঘরে ঢুকতেই বিশু আমাকে বলল, “তোর ইমেইল আইডি আছে?”

আমি মাথা নাড়ালাম।

বিশু আমাকে আমার ফোনটা এগিয়ে দিয়ে বলল, “এই নম্বরে তোর ইমেইল আইডিটা এসএমএস করে দে তো। আর তোর ফোন থেকে ইমেইল দেখা যায়?”

আমি বললাম “হ্যাঁ।” তারপর নম্বরটায় আমার ইমেইল আইডিটা পাঠিয়ে দিলাম।

বিশু বলল, “কাজ শেষ। এবার অপেক্ষা কর।”

মিনিট দশেকের নিস্তব্ধতা। অনেকগুলো চরিত্র মাথার মধ্যে ঘোরাফেরা করছিল। যদিও পরিষ্কার নয় কিছুই। বিশু কী ধরতে পেরেছে কিছু? কার হাত

আছে এর পিছনে? নারায়ণকে কে দিতে বলল কাগজগুলো? এই পাহাড়-সমুদ্র ইত্যাদির গল্পটাই বা কী? আজ পাঁচদিন হয়ে গেল। বাচ্চাগুলো কেমন আছে?

ফোনটা বেজে উঠল পকেটে। বের করে দেখলাম, ইমেইল ঢুকেছে। ডঃ ভট্টাচার্য্যের পাঠানো ইমেইল।

আমি বিশুর দিকে বাড়িয়ে দিলাম সেটা।

ইমেইলটা পড়ে বিশুর মুখ প্রসন্নতায় ভরে গেল। তারপরে বলল, "একটা ব্যাপার খালি বুঝতে পারছিনা বুঝলি। বাচ্চাদের মনস্তাত্ত্বিক বিষয় একটা। শ্যামবাজারের স্কুলের ওই ভদ্রলোক। বাচ্চাদের মনস্তত্ত্ব বোঝে। উনি সাহায্য করবেন বলেছিলেননা?"

আমি উৎসাহ পেয়ে বললাম, "হ্যাঁ, বলেছিলেন বইকি। আমার কাছে ওই স্কুলের প্রিন্সিপাল অশোকবাবুর নম্বর আছে। তাকে ফোন করলেই ওনার সাথে কথা হয়ে যাবে। কাল তাহলে দেখা করবি?"

"উঁহু... আজকেই।"

আমি অশোকবাবুকে ফোন করে সুদীপ্ত দাসগুপ্তর ফোন নম্বর জোগাড় করলাম। সুদীপ্তবাবুকে ফোন করে তাকে জানালাম। তিনি এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন। তার বাড়ি শ্যামবাজারেই। আমি বললাম আমরা পনের মিনিটের মধ্যে পৌঁছচ্ছি।

ট্যাক্সিতে উঠতে উঠতে বিশু বলল, “সুজনবাবুর বইতে একটা অদ্ভুত গল্প পড়লাম বুঝলি। শুনবি?”

৬)

পনের মিনিট পর পৌঁছলাম সুদীপ্তবাবুর বাড়ি। কলিং বেল বাজাতেই তিনি হাসিমুখে দরজা খুলে অভর্থনা জানালেন। আমরা ঘরে ঢুকলাম।

বসার ঘরে একটা সোফা রাখা। আমি সেখানে বসলাম। উল্টোদিকের একটা চেয়ারে সুদীপ্তবাবু বসলেন। বিশু চিন্তিত মুখে পায়চারি করতে থাকল।

সুদীপ্তবাবু আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, “বলুন। কিভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি?”

বিশু বলে উঠল, “একটা গল্প শোনাই আগে আপনাকে সুদীপ্তবাবু। সেটা শুনে আপনার মতামত বলুন আমায়।”

সুদীপ্তবাবু পিছনে ঘুরে বিশুর উদ্দেশ্যে বলল, “হ্যাঁ বলুন। যদি পারি অবশ্যই সাহায্য করব।”

বিশু বলতে শুরু করল, “আজ থেকে সাত বছর আগের একটা ঘটনা বুঝলেন। একটি বাচ্চা ছেলে, নাম দীপু, সে গল্পের বই পড়তে ভালবাসত খুব। বেশ কল্পনাপ্রবণ ছিল। গল্পের চরিত্রের সাথে নিজেকে জড়িয়ে ফেলত। সে একদিন

একটা গল্প পড়ল। একটু অদ্ভুত গল্পটা। তাতে ছিল, গল্পের চরিত্রটির বাড়ির একটা দেওয়ালের পিছনে অদ্ভুত জগৎ লুকানো। ভীষণ সুন্দর একটা দৃশ্যকল্প। একটা নীল রঙের পাহাড়। যার উপর সমুদ্রের জল আছড়ে পড়ছে। সেখানে গেলে কেউ আর এই নোংরা শহরটায় ফিরতে চায়না। এই গল্পটা তার মনে প্রবলভাবে দাগ কেটে ফেলল। কিন্তু তারপরেই সে করে বসল মস্ত একটা ভুল। কোনওভাবে সে নিজেকে আবদ্ধ কোনও জায়গায় বন্দী করে ফেলল। ছেলেটির মা ছিলনা। বাবা ছিল, যে ছেলেকে পাগলের মত ভালবাসে। তার বাবা তাকে পাগলের মত খুঁজল। শহরের প্রত্যেকটা গলিতে। পেলনা। এরপরে একদিন তার বাবা উদ্ধার করল তাকে। তখন দীপুর অবস্থা খুব খারাপ। সম্ভবত রাত্রিবেলা ছিল। সে ছেলেকে বুকে করে পাগলের মত দৌড়তে থাকল। যানবাহন নেই। একটা ট্যাক্সি দাঁড়িয়েছিল। সেই ট্যাক্সিওয়ালা ছিল খুব অসভ্য। এতটাই অসভ্য যে একজন রোগীকে নিয়ে যেতে অবধি সে রাজী হলনা। অগত্যা দীপুর বাবা তাকে নিয়ে দৌড়তে থাকল। বেশ কিছুক্ষণ পর, অন্য কোনো যানবাহনে বা পায়ে হেঁটেই সে পৌঁছল একজন নামকরা ডাক্তারের বাড়ি। তার কাছে ছেলেকে দিয়ে সে আশায় বুক বাঁধল। কিন্তু বিধি বাম। যশ থাকা সত্ত্বেও দীপুর অবস্থা এতই খারাপ ছিল যে তিনি তাকে বাঁচাতে পারলেননা। বাচ্চাটির বাবার সব আশা শেষ হয়ে গেল। ছেলেকে ঘিরেই ছিল তার সব স্বপ্ন। তার সব রাগ গিয়ে পড়ল তিনজনের উপর। গল্পটির লেখক, ট্যাক্সিওয়ালা আর সেই ডাক্তার। সে ঠিক করল এর প্রতিশোধ নেবে। সন্তান হারানোর কষ্ট হাড়ে হাড়ে টের পাওয়াবে এই তিনজনকে। সে তখন চলে গেল লন্ডন। বাচ্চাদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে পড়াশুনা করতে। ওকি সুদীপ্তবাবু উঠছেন কোথায়? একদম পালানোর চেষ্টা করবেননা। গল্প এখনও শেষ হয়নি। অবিনাশ একটু দ্যাখ তো। সুদীপ্তবাবু যেন গল্পটা শোনেন মন দিয়ে। হ্যাঁ, যা

বলছিলাম, তো লন্ডন থেকে ফেরার পর এই ভদ্রলোকটির একটাই উদ্দেশ্য ছিল। তা হল ছেলের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেওয়া। বাচ্চাদের সে অল্প কথাতেই বশ করতে পারত। তেমনভাবেই সে বশ করে ফেলল এই বাচ্চাগুলিকে। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, ঠিক তেমন কষ্ট দেওয়া যা তার ছেলে পেয়েছিল...”

আমি সুদীপ্তকে পিছমোড়া করে হাতকরা পরিয়ে দিয়েছিলাম ইতিমধ্যেই। বিশু দৌড়ে গেল বাঁদিকের ঘটায়। মিনিট খানেক পর সেখান থেকে বেরিয়ে পাশের ঘরে। তারপর দুতলায়। সুদীপ্ত ছটফট করছিলেন। আমি তার কানের কাছে ফিসফিস করে বললাম, “এমন করলে কিন্তু বাকি গল্প শুনতে পাবেননা। আপনার মাথায় মেরে অজ্ঞান করতে বাধ্য হব।”

দুতলা থেকে বিশুর আওয়াজ পেলাম, “অবিনাশ, সুদীপ্তবাবুকে নিয়ে একটু উপরে আয় তো।”

আমি ফোন করলাম। বাইরে বিক্রমদা, দিলীপ সহ আরও পাঁচজন কন্সটেবল অপেক্ষায় ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তারা ভিতরে প্রবেশ করল। সুদীপ্তবাবুকে বিক্রমদার হাতে চালান করে আমি উপরে উঠে গেলাম। আমার পিছন পিছন বাকিরাও এল।

একটা ঘর। দরজায় তালা দেওয়া। আমি সুদীপ্তবাবুর দিকে তাকিয়ে বললাম, “এর চাবিটা কোথায়?”

কোনও উত্তর এলনা। বিশু বলল, “সময় নেই হাতে। ভেঙ্গে ফ্যাল।”

মিনিট তিনেকের মধ্যে ভেঙ্গে গেল দরজা।

ভিতরে ঢুকে নিরাশ হলাম। একটা অব্যবহৃত ঘর। চারিদিকে ধুলো। আসবাবপত্রও নেই কোনও। বিশু একটা দেওয়ালের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। দেওয়ালে একটা বড় ছবি। একটা দৃশ্য আকা। সমুদ্রের পর পাহাড়। পাহাড়ের পিছন দিয়ে সূর্যাস্ত হচ্ছে।

বিশু সেদিকে তাকিয়ে বলল, "এই ছবিটার পিছনে কি আছে সুদীপ্তবাবু?"

সুদীপ্ত উত্তর দিলেননা। আমি দিলীপের দিকে তাকিয়ে বললাম, "দিলীপ, কুইক।"

নীচ থেকে একটা চেয়ার নিয়ে আসা হল। দিলীপ সেটায় উঠে ছবিটা সরালো। একটা বড় ফাঁকা অংশ ছবিটার পিছনে। দিলীপ চেঁচিয়ে বলল, "হে ভগবান, স্যর, তিনজনই আছে। বেঁচে আছে কিনা বুঝতে পারছিনা।"

আমার বুক কেঁপে উঠল। বিক্রমদার দিকে তাকিয়ে বললাম, "অ্যাম্বুলেন্স রেডি তো?"
বিক্রমদা মাথা নাড়ল।

সেদিন বাড়ি ফিরতে প্রায় ভোর তিনটে বেজে গিয়েছিল। বিশুর ঘরে বসে চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললাম, "কী মনে হয়? বেঁচে যাবে?"

বিশু বলল, “দ্যাখা যাক। ডঃ ভট্টাচার্য্য নিজের ছেলের বেলায় নিশ্চয়ই এক ভুল করবেননা।”

আমি চায়ের কাপটা রেখে বললাম, “কিন্তু তুই বুঝলি কি করে? শুরু থেকে বল।”

বিশু নীচু স্বরে বলল, “প্রথম থেকেই আমার সন্দেহ হয়েছিল সুদীপ্তর উপর। কারণ দিন দুপুরে এভাবে দশ এগারো বছরের বাচ্চাদের অপহরণ সহজ কথা নয়। এখনকার বাচ্চারা অনেক বেশি স্মার্ট। তারা নতুন নতুন টেকনোলজি নিয়ে বড় হচ্ছে। সিনেমা দেখছে, বই পড়ছে। এই কাজ এমন কারোর পক্ষেই সম্ভব যে বাচ্চাদের বশ করতে পারে। কৌস্তভ নামের ছেলেটি সুদীপ্তর সাথে কথা বলতেই সহজ হয়ে যেতে দেখে আমার প্রথম সন্দেহ হয়। খুব সম্ভবত সুদীপ্ত চেয়েছিল সন্দেহটা চঞ্চল বসুর উপর গিয়ে পড়ে। সেটাই কৌস্তভকে দিয়ে আমাদের মনে ঢোকাতে চেয়েছিল। যাতে সময় নষ্ট হয়। আর বাচ্চাগুলোর মৃতদেহ ততদিনে পৌঁছে যায় তাদের পরিবারের কাছে। কেউ বুঝতেও পারবেনা কি হল। এরপর কৌস্তভের মুখে পাহাড়-সমুদ্র শুনে আমি বুঝি একটা গল্প জড়িয়ে আছে এতে। এরপরই সুজনবাবুর গল্পে সেই দৃশ্যকল্পটা পড়ি। নারায়ণের উপর সন্দেহের কথা তো বলেইছিলাম। ওর স্টলে ফোন নম্বরটা মুখস্থ করে নিয়েছিলাম। এরপরে অন্ধকারে ঢিল ছুঁড়ি একটা। ঠিক জায়গায় লাগে। এখানেও সেই এক গল্প শুনে অন্ধকার অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেছিল। একটা দৃশ্য স্পষ্ট হয়ে আসছিল চোখের সামনে। এরপর ডঃ ভট্টাচার্য্যকে ফোন করে বলি আজ থেকে ঠিক সাত বছর আগে, ২০০৮ সালে

ওনার আন্ডারে যে পেশেন্টরা মারা যায় তাদের নাম, আত্মীয়ের নাম আর মৃত্যুর ধরণ আমাকে পাঠাতে। একত্রিশটা নাম আসে। তার মধ্যে একটি নাম ছিল দীপন দাশগুপ্ত, কেয়ার অফ সুদীপ্ত দাশগুপ্ত। মৃত্যুর ধরণ, শ্বাসরোধ বা সাফোকেশন। ব্যস, সবকিছু জলের মত স্বচ্ছ হয়ে যায় আমার কাছে। সুদীপ্তবাবু ওই গল্পটার জাল পেতেই বশ করতে চেয়েছিলেন যাতে নাটকীয়ভাবে ওনার প্রতিশোধ সম্পন্ন হয়। দুঃখ শুধু একটাই, এভাবে চরিত্রের নাম, দিপুর ঘরের ওই ছবির সাথে লেখার মিল, তার সাথে তার কল্পনাপ্রবণ চরিত্র, সবকিছু মিলে না গেলে দিপুর প্রাণ যেতনা।

## Audio visual page : প্রণব কুমার কর

যাও যাও গিরিরাজ

https://drive.google.com/file/d/1Al3OgBY2UrnDGbsheXVtAO0XaqGWXCSz/view?usp=sharing

## খরস্রোতা:

## Audio visual page : দিনান্তের নৌবহর

ভালোবাসা প্রথম বনলতা সেনের হাত ধরে, আজ দীর্ঘদিন বাদে, আবার তাই জীবনানন্দের আশ্রয়েই আমি "আবার আসিব ফিরে" ঈপ্সিতা ও আমার নিবেদন ॥ দিনান্তের নৌবহর॥ চিত্র: রিমা,ঈপ্সিতা,দেবার্ঘ্য আবহসংগীত: সৌমাভ

https://www.youtube.com/watch?v=d4aK7ynCN14&ab_channel=%E0%A6%96%E0%A6%B0%E0%A6%B8%E0%A7%8D%E0%A6%B0%E0%A7%8B%E0%A6%A4%E0%A6%BE%5BKhorosrota%5D

...সৃজিতা চক্রবর্তী

# লিমেরিক

...স্মৃতি বেগ বিশ্বাস

## লিমেরিক --১

কাতর প্রাণে আতর নেই আজ দ্বন্দ্বে
তবু আমি লিখছি আপন ছন্দে--
স্বাধীন কলম-খাতায়
লিখছি বর্ণমালায়,
জীবনটা তো কাটবে জানি ভালো এবং মন্দে।

## লিমেরিক--২

কালকে তোমায় খুঁজতে যাব অচিনপুরের হাটে--
পাল-তোলা ঐ নৌকাখানি ভিড়বে নদীর ঘাটে--
রাতের শেষে ফুটবে ফুল
হবেনা আর কোনোই ভুল
মোতির ঝাড়ে জ্বলবে বাতি চাঁদ-জোছনার মাঠে।

# উপলব্ধি

## ... স্মৃতি বেগ বিশ্বাস

আমি পরাণের সাথে খেলব আজকে প্রণয় খেলা
খেলার লহরী দেবেই প্রাণে মাতন-দোলা
দোলায়িত প্রাণে বাজবে বাঁশির মধুর সুর
সুরের সাধনে মুখরিত হবে নিকট-দূর

দূরকে করব নয়নাভিরাম প্রাণের মাঝে
মাঝে শুধু রবে প্রেম,ভালোবাসা সকল কাজে
কাজের সোহাগে সকলে করব কর্ম সাধন
সাধন মানে আরাধনা আর সত্য পালন

পালন করব জীবন ব্যাপিয়া মানবধর্ম
ধর্ম মানে করতে হবেই ন্যায়ের কর্ম
কর্মে,ধর্মে মহীয়ান হওয়া সত্যি দামী
দামী, নামী ছেড়ে বুঝতে হবে কে সে আমি !

...প্রীতম দাস

# ককেশাসের কেলেঙ্কারি

...শুভম সরকার

ঐতিহাসিক এবং ভৌগলিক ভাবে সুপরিচিত বর্তমান তুরস্কের অন্তর্গত 'এশিয়া মাইনর' বা আনাতোলিয়া মালভূমির পূর্ব দিকে যে বিন্দুতে এশিয়া এবং ইউরোপ মহাদেশ মিলিত হচ্ছে, সেই বৃহত্তর ইউরেশীয় ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী স্থানে 'ক্যাস্পিয়ান সাগর' এবং 'কৃষ্ণ সাগর' কে বিচ্ছিন্ন করেছে ককেশাস পর্বতমালা। এই ককেশাস পার্বত্য অঞ্চল পরিচিত 'ককেশিয়া' নামে এবং এই ককেশিয়া অঞ্চলের উত্তরভাগ চিহ্নিত হয় 'সিসককেশিয়া' বলে এবং দক্ষিণভাগ পরিচিত 'ট্রান্স ককেশিয়া' নামে। 'ট্রান্সককেশিয়া' বা 'দক্ষিণ ককেশিয়া' এই সমগ্র ককেশীয় ভূভাগের সর্বাধিক জনবহুল অঞ্চল এবং ঐতিহাসিক ভাবে সুপ্রসিদ্ধ ও সমৃদ্ধ। ট্রান্সককেশীয় অঞ্চলে ককেশীয় জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বৈচিত্র্য চোখে পড়ার মতো এবং এই অঞ্চলেই রয়েছে তিনটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র, যথাক্রমে; আর্মেনিয়া, আজেরবাইজান এবং জর্জিয়া। এই সমগ্র 'ট্রান্সককেশিয়া' উত্তরে রাশিয়া, পূর্বে ক্যাস্পিয়ান সাগর, দক্ষিণে ইরান এবং তুরস্ক এবং পশ্চিমে কৃষ্ণ সাগর দ্বারা পরিবেষ্টিত। আশা করা যায়, এর থেকেই সমগ্র ককেশীয় পার্বত্য অঞ্চলের ব্যাপ্তি সম্পর্কে আন্দাজ করা যাচ্ছে, যার মধ্যে অতি অবশ্যম্ভাবী রাশিয়া, তুরস্ক এবং ইরানও অন্তর্ভুক্ত। অসাধারণ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এবং খনিজ সম্পদের জন্য বিখ্যাত এই ককেশীয় ভূভাগ দীর্ঘকাল ধরে বিভিন্ন রাজনৈতিক পরাশক্তির ক্ষমতার প্রদর্শনী কক্ষ হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে এবং সেই অনুপাতেই আবর্তিত হয়েছে দক্ষিণ ককেশীয় জাতিরাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক সম্পর্ক। বর্তমানে পুনরায় আরও একবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এই দক্ষিণ ককেশীয় রাজনীতি, সৌজন্যে দুই জাতিরাষ্ট্র আর্মেনিয়া ও আজেরবাইজানের মধ্যে ব্যাপক মাত্রায় সংঘর্ষ। কিন্তু কেন এই সংঘর্ষ? কেনই বা ব্যবহার করছি 'পুনরায়' শব্দটি? আর্মেনীয় এবং আজেরবাইজানি জাতিদ্বয়ের মধ্যে বিদ্বেষের শিকড় কোথায়? সংক্ষেপে চেষ্টা করব এই প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়ার।

আর্মেনিয়া, একটি দক্ষিণ ককেশীয় স্থলবেষ্টিত জাতিরাষ্ট্র। আয়তন এবং জনসংখ্যার দিক থেকে অতি নগণ্য (জনসংখ্যা আনুমানিক ৩০ লক্ষ) এই দেশ প্রাচীন সভ্যতার লীলাভূমি এবং একটি সমৃদ্ধ অতীতের অধিকারী। বর্তমানে আর্মেনিয়ার যা আয়তন, অতীতে তা আরো বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কৃষ্ণ সাগরের দক্ষিণ তীর থেকে ক্যাস্পিয়ান সাগর এবং ভুমধ্যসাগর থেকে ইরানের উরমিয়া হ্রদ পর্যন্ত ছিল এর ব্যাপ্তি। বর্তমানে সারা বিশ্বে বসবাসকারী আর্মেনীয়

জাতিগোষ্ঠীর জনসংখ্যা, প্রকৃত আর্মেনিয়ার জনসংখ্যাকে বহুল ভাবে অতিক্রম করে যাবে। আর্মেনিয়া বিশ্বের প্রাচীনতম খ্রিস্টান রাষ্ট্র, ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিগুলির মধ্যে সবার প্রথমে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে এই আর্মেনীয়রা। আর্মেনিয়ার অ্যাপস্টলিক চার্চ, ওরিয়েন্টাল অর্থোডক্স খ্রিস্টধর্মের অন্যতম কেন্দ্র। আর্মেনিয়া উত্তরে জর্জিয়া, পূর্বে আজেরবাইজান এবং আর্টসাখ প্রজাতন্ত্র (নগর্নো-কারাবাখ, যা নিয়ে বিরোধের সুত্রপাত), দক্ষিণে ইরান এবং আজেরবাইজানের বিচ্ছিন্ন অংশ নাখচিভান, পশ্চিমে তুরস্ক দ্বারা পরিবেষ্টিত। বহু বছরের পরাধীনতায় এবং সাম্রাজ্যবাদীদের রোষানলে পড়ে আর্মেনীয় জাতি ইতিহাসের পাতায় অত্যাচারিত জাতিসমূহের তালিকায় প্রথম স্থানের দাবী জানাতেই পারে। ব্যবসাবাণিজ্য এবং অন্যান্য জীবিকার সন্ধানে আর্মেনীয়রা চিরকালই নিজেদের স্বদেশ ছেড়ে পাড়ি দিয়েছে দূর দুরান্তে। ভারতবর্ষ তথা আমাদের এই বঙ্গদেশের সহিত আর্মেনীয়দের যোগাযোগ বহু পুরোনো। ১৬৯০ খ্রিস্টাব্দে সুতানূটিতে জব চার্নকের পদার্পণের বহু আগে ১৬৩০ খ্রিস্টাব্দে রেজাবিবি সুকিয়াস নামক আর্মেনীয় মহিলার সমাধির সন্ধান পাওয়া গেছে, যা থেকে ধারণা করাই যায় আর্মেনীয়দের সাথে কলকাতার এই সম্পর্ক কত প্রাচীন। ভারতে আসা প্রথম খ্রিস্টান জাতি এই আর্মেনীয়রা; ১৬৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়া আর্মেনীয় গির্জা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহজপাঠের পাতায় যার নাম পাই আমরা, কলকাতার প্রথম প্রতিষ্ঠিত গির্জা। ইংরেজদের সাথে মুর্শিদাবাদের ষড়যন্ত্রীদের মধ্যে মধ্যস্থতাও করেছিলেন খোজা আরাটুন পেত্রুস নামে এক আর্মেনীয় বণিক, আবার নবাব মীরকাশিমের সেনাদলের এক প্রভাবশালী সেনাপতিও ছিলেন খোজা গ্রেগরি নামে এক আর্মেনীয় ভাগ্যান্বেষী। কলকাতার রাস্তার নামকরণে আর্মেনীয় চ্যারিটেবল সুকিয়াসের স্মৃতি ভেসে আসাই হোক কিংবা গ্র্যান্ড হোটেলের প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে আরাটুন স্টিফেনের ভূমিকা, আর্মেনীয়দের সাথে আমরা ইতিহাসের সম্পর্কে আবদ্ধ। এখানে যদিও এসব বলা অবান্তর এবং ইরান থেকে আগত এই আর্মেনীয়দের সাথে ককেশীয় আর্মেনিয়া রাষ্ট্রের সম্পর্ক কতটা ছিল বলা মুশকিল, কিন্তু আর্মেনীয় জাতির পরিচয় দেওয়ার জন্য এই সম্পর্কের রসায়নের কাহিনী পাঠকদের সাথে ভাগ করে নিলাম।

চৌদ্দশ শতাব্দী নাগাদ ক্রমবর্ধমান শক্তিশালী অটোমান তুর্কি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় আর্মেনিয়া। পরবর্তীতে এই ভূভাগের ওপর অধিকার কায়েম রাখার স্বার্থে দীর্ঘ এক শতকের বেশী সময় ধরে তৎকালীন পারস্যের সাফাভিদ শাসকদের সাথে যুদ্ধে ব্যস্ত থাকে অটোমানরা, ১৬২০ সালে এক সন্ধির মাধ্যমে আর্মেনীয় জাতি অধ্যুষিত ককেশাস, অটোমান ও সাফাভিদদের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে জার শাসিত রাশিয়া ককেশাসে সামরিক অভিযান চালিয়ে অটোমান আর্মেনিয়ার একটা বড়ো অংশ দখল করে নেয়। সেই সময় থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবধি আর্মেনীয় ভুমির পশ্চিমাংশ অটোমান তুর্কিদের হাতে এবং পূর্বাংশ জার শাসিত রাশিয়ার হাতে ন্যস্ত ছিল। অটোমান এবং রাশিয়ান সাম্রাজ্য, উভয়ের হাতেই আর্মেনীয়রা নিপীড়িত হয়ে আসছিল তবে এর চরম

নিদর্শন দেখা যায় ১৯১৫ সালে তুর্কিদের দ্বারাই। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালে দক্ষিণ আনাতোলিয়ার কুর্দিশ তুর্কি অধ্যুষিত অঞ্চলের প্রাচীন আর্মেনীয় জনপদগুলিতে, অটোমান তুর্কি প্রশাসন এক ভয়ঙ্কর গণহত্যা সংঘটিত করে এবং প্রায় ৬ লক্ষ থেকে ১৫ লক্ষ আর্মেনীয়কে হত্যা করে, বহু আর্মেনীয়কে বলপূর্বক ইরাক ও সিরিয়ার মরুভূমিতে নির্বাসনে পাঠিয়ে হত্যা করা হয়। আশঙ্কা করা হয়েছিল, ধর্মে খ্রিস্টান আর্মেনীয়রা মুসলিম তুর্কি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জারের রাশিয়ার প্রতি আনুগত্য দেখাবে; বিংশ শতাব্দীর এই প্রথম গণহত্যার মাধ্যমে পশ্চিম আর্মেনিয়ার আর্মেনীয় জনসংখ্যা তলানিতে নেমে আসে এবং তা তুর্কি অধ্যুষিত হয়ে ওঠে। ১৯১৬ সালে রাশিয়া আর্মেনিয়ার অধিকাংশ ভূমি দখল করে নিলেও ১৯১৭ সালের বলশেভিক বিপ্লবের পরবর্তীতে দুর্বল সোভিয়েত রাশিয়া সেই সকল অধিকৃত ভূমি এক চুক্তির মাধ্যমে ক্ষয়িষ্ণু অটোমানদের হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। এই সময় আর্মেনীয় জাতীয়তাবাদ প্রবল হয়ে উঠলে রাশিয়া অধিকৃত পূর্ব আর্মেনিয়া ১৯১৮ সালের এপ্রিল-মে মাসে স্বাধীনতা ঘোষণা করে মধ্যযুগ পরবর্তী সময়ে প্রথমবার স্বাধীন আর্মেনিয়ার আবির্ভাব ঘটায়। এই সময় অন্যান্য দক্ষিণ ককেশীয় জাতি, যথা আজেরবাইজান ও জর্জিয়ার সাথে মিলিত হয়ে 'ট্রান্সককেশীয় ফেডারেল রিপাবলিক' গঠন করলেও জাতিসত্ত্বার সংঘাতের কারণে তা খুব অল্প সময় স্থায়ী হয়। অটোমান তুর্কিদের সাথে সীমান্তজনিত সংঘর্ষে এবং আন্তর্জাতিক চাপে আর্মেনিয়া পুনঃপুনঃ জায়গা হারাতে থাকে এবং ১৯২০ সালে মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত তুরস্কের জাতীয়তাবাদী সরকার আর্মেনিয়া আক্রমণ করে পূর্বতন সকল অটোমান অধিকৃত আর্মেনীয় ভূমি পুনর্দখল করে নেয়, আর্মেনিয়ার দক্ষিণ পশ্চিমের নাখচিভান প্রজাতন্ত্রও এই সময় স্বীকৃতি পায়। ১৯২০ সালেই সোভিয়েত বলশেভিকরা আর্মেনীয় বলশেভিকদের সহায়তায় আর্মেনিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে এবং 'সোভিয়েত সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক' হিসাবে নিজেদের চিহ্নিত করে। ১৯২২ সালে আর্মেনিয়া 'ট্রান্সককেশিয়ান সোভিয়েত ফেডারেটেড সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক' এর অংশ হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে (U.S.S.R) যোগদান করে।

আজেরবাইজান, আরেকটি দক্ষিণ ককেশীয় জাতিরাষ্ট্র। প্রতিবেশী আর্মেনিয়ার থেকে আয়তন, জনসংখ্যা এবং প্রাকৃতিক সমৃদ্ধি, সব দিকেই কয়েক কদম এগিয়ে। আজেরবাইজানিরা বৃহত্তর তুর্কি জাতির অংশ, এবং তাদের ভাষা 'উইঘুজ তুর্কি' ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্গত। আজেরবাইজানের জনসংখ্যা আর্মেনিয়ার তিনগুণ (প্রায় ২ কোটি), বৃহত্তর তুর্কি জাতির অংশ হওয়া সত্ত্বেও ককেশীয় আজেরবাইজানিরা ধর্মীয় ভাবে শিয়া মুসলিম এবং সুন্নি তুর্কি সংস্কৃতির পরিবর্তে ইরানীয় শিয়া সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক। আজেরবাইজান উত্তরে রাশিয়া, পূর্বে ক্যাস্পিয়ান সাগর, দক্ষিণে ইরান, পশ্চিমে আর্মেনিয়া এবং উত্তর পশ্চিমে জর্জিয়া দ্বারা পরিবেষ্টিত। আজেরবাইজান থেকে বিচ্ছিন্ন 'নাখচিভান প্রজাতন্ত্র' রাষ্ট্রটির অন্তর্গত একটি স্বায়ত্ত্বশাসিত অঞ্চল।

আজেরবাইজান দীর্ঘকাল পারস্যের সাফাভিদ শাহদের অধীনস্থ কয়েকটি খানাতে বিভক্ত ছিল; যথাক্রমে সামাখি, গাঞ্জা, বাকু এবং কারাবাখে এই খানাতগুলির ব্যাপ্তি ছিল। জার শাসিত রাশিয়ার সাথে বেশ কয়েকটি যুদ্ধের পর পারস্যের শাহ ১৮১৩ খ্রিস্টাব্দে গুলিস্তান এবং ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে তুর্কমাঞ্চির সন্ধির মাধ্যমে ককেশীয় মুসলিম আজেরবাইজানিদের মধ্যে সীমারেখা টেনে দেন। সন্ধির মাধ্যমে বাকু, সামাখি, গাঞ্জা, কারাবাঘ অঞ্চলগুলি রাশিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং উত্তর ইরানের চারটি আজেরবাইজানি অধ্যুষিত প্রদেশ শাহের অধীনে থেকে যায়। রাশিয়ান সাম্রাজ্যের অন্তর্গত আজেরবাইজানিরা 'ককেশীয় তাতার' নামে পরিচিত ছিল। ১৮৪৮-৪৯ সাল নাগাদ বাকুর ক্যাস্পিয়ান সাগর সংলগ্ন অঞ্চলে বিশ্বের সর্বপ্রথম তৈলখনি আবিষ্কৃত হয় এবং তৈলসম্পদে সমৃদ্ধ আজেরবাইজানের অর্থনীতি ফুলেফেঁপে উঠতে থাকে। আর্মেনীয় এবং আজেরবাইজানিদের মধ্যে জাতিগত বিদ্বেষের চোরাস্রোতের মধ্যেই ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লব সংঘটিত হয়। দক্ষিণ ককেশাস থেকে রাশিয়ান সৈন্যবাহিনীর অপসারণের সাথে সাথেই আজেরবাইজানের বাকু সহ অন্যান্য প্রান্তে আর্মেনীয়দের সাথে আজেরবাইজানিদের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ শুরু হয়ে যায়; এরই মধ্যে উভয় রাষ্ট্রের বলশেভিক বিরোধী নেতৃত্ববৃন্দ পূর্বে বর্ণিত ট্রান্সককেশীয় ফেডারেশনের পরীক্ষানিরীক্ষায় গেলেও জাতিগত বিদ্বেষের কারণে তা ব্যর্থ হয়। ১৯১৮ সালের ২৮শে মে অটোমান সাম্রাজ্যের মদতে আজেরবাইজান স্বাধীনতা ঘোষণা করে। রাজধানী বাকুতে তখন সংখ্যালঘু কমিউনিস্ট গোষ্ঠীর সরকার এবং সেই সরকারের মেরুদণ্ড একদল আর্মেনীয় সৈন্য। কয়েকবার সংঘর্ষের পর সেপ্টেম্বর মাসে অটোমান এবং আজেরবাইজানি সৈন্যদল মিলিতভাবে বাকু দখল করে সেখানকার সকল রাশিয়ান এবং আর্মেনীয় অধিবাসীদের হত্যা করে। এর কিছুদিন পরেই অটোমান তুর্কিরা বিশ্বযুদ্ধে ধ্বস্ত হলে বিভিন্ন অঞ্চলের দখল নিয়ে আর্মেনীয় ও আজেরনাইজানিদের মধ্যে প্রথম যুদ্ধ আরম্ভ হয়। এর মধ্যেই রাজধানী বাকুতে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বলশেভিকবাদ চাড়া দিয়ে ওঠে এবং এই বলশেভিকদের সহায়তাতেই ১৯২০ সালের এপ্রিল মাসে সোভিয়েত লাল ফৌজ আজেরবাইজান অধিকার করে। ১৯২২ সালে এই 'আজেরবাইজান সোভিয়েত স্যোশালিস্ট রিপাবলিক' আর্মেনিয়া ও জর্জিয়ার সাথেই 'ট্রান্সককেশিয়ান সোভিয়েত ফেডারেটেড সোশ্যালিস্ট রিপাবলিক' এর অংশ হয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে (U.S.S.R) যোগদান করে।

আজেরবাইজান ও আর্মেনিয়া পরস্পরের প্রতিবেশী দুটি ভিন্ন জাতিসত্ত্বার রাষ্ট্র। ধর্ম এবং ভাষাগত দিক থেকে পৃথক দুই রাষ্ট্রের মধ্যে জাতিগত বিরোধ নতুন এবং অস্বাভাবিক কিছু নয় এবং আর্মেনীয় ও আজেরবাইজানিদের মধ্যে জাতিগত দ্বন্দ্ব সেই ঐতিহ্যই বহন করে নিয়ে চলেছে। দীর্ঘকাল ধরে আর্মেনীয় ও আজেরবাইজানিরা (ককেশীয় তাতার) কোনো না কোনো শক্তিশালী পরাশক্তির হাতে শোষিত ছিল এবং দুই জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে নির্দিষ্ট কোন সীমারেখা না থাকায় দক্ষিণ ককেশাসে দুই জাতির জনসংখ্যায় মিশ্র এলাকা কম ছিলনা। পারস্যের

শাহকে পরাস্ত করে রাশিয়া দক্ষিণ ককেশাস অধিকার করে নিলে আর্মেনীয় এবং আজেরবাইজানি উভয় জাতিই আধুনিকতার সংস্পর্শে আসে এবং আধুনিকতার সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে তীব্র স্বজাত্যবোধ। ১৯০১ সালে আজেরবাইজানি মুসলিম অধ্যুষিত বাকু শহরে পেট্রোলিয়াম উত্তোলনের ব্যবসায় লাভবান হচ্ছিল আধুনিক শিক্ষা, সংস্কৃতিতে এগিয়ে থাকা শহরের আর্মেনীয় জনগোষ্ঠী। নিজেদের ভুমিপুত্র বলে মনে করা মুসলিম আজেরবাইজানিরা মুলতঃ ছিল শিল্পশ্রমিক এবং তাদের জীবনযাত্রার মান ছিল নিম্নস্তরীয়। প্রশাসন, অর্থনীতি সব কিছুতে পিছিয়ে পড়ে আজেরবাইজানি জননেতারা বেছে নিলেন উগ্র জাতীয়তাবাদের রাস্তা এবং ১৯০৫ সালে বাকু, নাখচিভান, সুশা এবং এলিজাবেথপোলে দফায় দফায় ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। প্রায় ৩,০০০ থেকে ১০,০০০ আর্মেনীয় এবং আজেরবাইজানি নিহত হয়; যদিও এই দাঙ্গা পরিস্থিতিতে আখেরে সর্বোচ্চ ক্ষয়ক্ষতি শিকার করেছিল আজেরবাইজানিরাই। রুশ সৈন্যদের হস্তক্ষেপে দাঙ্গা পরিস্থিতি শান্ত হলেও বিদ্বেষের আগুন ধিকিধিকি জ্বলতে থাকে। ১৯১৮ সালে স্বাধীনতা ঘোষণা কালে আজেরবাইজানে পুনরায় আর্মেনীয় বিরোধী দাঙ্গা আরম্ভ হয়। বিশ্বযুদ্ধকালে অটোমান তুর্কিদের হাতে গণহত্যার শিকার হওয়া আর্মেনীয়রা ইতিমধ্যে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করে নিজেদের হৃতসম্মান পুনরুদ্ধারে দৃঢ়সংকল্প হয়ে অটল থাকায় দুটি সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্র কারাবাখ, নাখচিভান, জাঙ্গেজুর প্রভৃতি অঞ্চলের অধিকার নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। তুর্কি মদতে পুষ্ট আজেরবাইজানিরা এই যুদ্ধে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকে; বাকু, জাঙ্গেজুর, কারাবাখ, সুশাতে সব মিলিয়ে প্রায় ৫০,০০০ বেসামরিক আর্মেনীয় নিহত হয়। এই সবের মধ্যেই বলশেভিক বিপ্লবীদের পরিচালনায় উভয় দেশে সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। উভয় জাতির মধ্যে সমঝোতার লক্ষ্যে পারস্পরিক কয়েকটি সভায় মস্কোর সোভিয়েত উচ্চ নেতৃত্ব কাজাখ, নাখচিভান অঞ্চলগুলি আজেরবাইজানকে এবং জাঙ্গেজুর আর্মেনিয়াকে অর্পণ করে। কিন্তু সমস্যার সুত্রপাত হয় 'কারাবাখ' অঞ্চলটি নিয়ে, যা আজকেও দক্ষিণ ককেশাসে উভয় জাতিরাষ্ট্রের মধ্যে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পটভূমি রচনা করেছে। কিন্তু এই কারাবাখ অঞ্চলে দ্বন্দ্বের কারণটা ঠিক কী?

'কারাবাখ' শব্দের অর্থ 'কালো বাগিচা।' এই ঐতিহাসিক কারাবাখ অঞ্চলের যে অংশটি নিয়ে বিরোধের আগুন বর্তমানে দাউদাউ করে জ্বলছে তা হলো 'নগর্নো-কারাবাখ।' নগর্নো শব্দের অর্থ 'পার্বত্য এলাকা।' প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর কারাবাখ অঞ্চলটি দুটি অংশে বিভক্ত, উচ্চ কারাবাখ বা নগর্নো-কারাবাখ এবং নিম্ন কারাবাখ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে কেবলমাত্র পার্বত্য কারাবাখ না, সমগ্র কারাবাখ অঞ্চলটি নিয়েই আর্মেনিয়া এবং আজেরবাইজানের মধ্যে দ্বন্দ্বের সুত্রপাত ঘটেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রুশ বিজয়ের পূর্বে আর্মেনিয়ার পূর্ব প্রান্তে এবং আজেরবাইজানের দক্ষিণ পশ্চিমে অবস্থিত কারাবাখ খানাত শাসিত হতো ইরান অনুগত একটি তুর্কি রাজবংশের দ্বারা। নিম্ন কারাবাখ অঞ্চলের অধিকাংশ প্রজা জাতিগত ভাবে ককেশীয় মুসলিম হলেও, উচ্চ কারাবাখ বা নগর্নো-

কারাবাখে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল আর্মেনীয় জাতিগোষ্ঠীর খ্রিস্টানরা। তুর্কি খানাতের শাসনামলেও এই নগর্নো-কারাবাখ পাঁচজন আর্মেনীয় সামন্ত দ্বারা স্বশাসিত ছিল। ১৯১৭-২০ এর টালমাটাল সময়ে আর্মেনিয়া এবং আজেরবাইজান উভয়েই এই কারাবাখ অঞ্চলের ওপর দাবী জানায় এবং প্রথম আর্মেনীয়-আজেরবাইজানি যুদ্ধের সূচনা হয়। সোভিয়েত শাসনকালের শুরুতে মস্কোর বলশেভিক নেতৃত্ববৃন্দ আর্মেনীয় এবং আজেরবাইজানি বলশেভিকদের সাথে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে এই কারাবাখ সমস্যার একটি স্থায়ী সমাধানে আসার উদ্যোগ নেয়। ১৯২০ সাল নাগাদ আজেরবাইজানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নরিমান নরিমানভ কারাবাখে আর্মেনীয় অধিকার স্বীকার করে নেন এবং ১৯২১ সালে আর্মেনিয়ার বলশেভিক সরকার অধ্যাদেশ জারির মাধ্যমে কারাবাখকে আর্মেনিয়ার অংশ বলে ঘোষণা করে। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আজেরবাইজানের বলশেভিক নেতৃবর্গ এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করলে মস্কোর হস্তক্ষেপ জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। সোভিয়েত রুশ সরকারের ককেশীয় ব্যুরো এই অচলাবস্থার সমাধানে এগিয়ে আসে এবং নানা টালবাহানার পর সরকারের জনকমিশনার জোসেফ স্তালিনের নির্দেশে ১৯২১ সালের ৫ই জুলাই কারাবাখ প্রদেশ 'আজেরবাইজান সোভিয়েত স্যোশালিস্ট রিপাবলিক' এর অংশ হয়। সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ ভালো করেই জানত কারাবাখ প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ আর্মেনীয় খ্রিস্টানরা এই সিদ্ধান্ত মেনে নেবেনা। যে কারণে আরেকটি চালে 'পার্বত্য কারাবাখ' বা 'নগর্নো-কারাবাখ' অঞ্চলকে একটি স্বশাসিত ওব্লাস্ত বা প্রদেশের মর্যাদা দেওয়া হয়, যা স্বায়ত্তশাসিত হলেও প্রশাসনিকভাবে অবস্থান করবে আজেরবাইজানের মধ্যে, একটি খ্রিস্টান আর্মেনীয় অঞ্চল হিসাবে। কারাবাখ প্রদেশকে আজেরবাইজানের অন্তর্ভুক্ত করার সোভিয়েত কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের পিছনে কয়েকটি কারণ ছিল বলে ধারণা করা হয়;

১) 'এক ঢিলে দুই পাখি মারার কৌশল', আর্মেনিয়া ও আজেরবাইজান, দুই বিবদমান জাতির মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার উদ্দেশ্যে সোভিয়েতের লক্ষ্য ছিল কারাবাখকে আজেরবাইজানের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে আজেরবাইজানিদের তুষ্ট করা, সাথে নগর্নো-কারাবাখের স্বশাসন প্রদানের মাধ্যমে আর্মেনীয়দের শান্ত রাখা।

২) কারাবাখ রেঞ্জের পর্বতমালার দ্বারা এই অঞ্চল ভৌগলিক ভাবে আর্মেনীয় ভূভাগের থেকে বিচ্ছিন্ন এবং এদের মাঝে আজেরবাইজানি ভূমি অবস্থিত। যে কারণে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কারাবাখের আজেরবাইজানে যোগ দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ বলে দাবী করেছিল সোভিয়েত কর্তৃপক্ষ।

৩) সোভিয়েত বলশেভিক সরকার আর্মেনিয়ার থেকে আজেরবাইজানকে ভুকৌশল এবং অর্থনৈতিক দিক থেকে বেশি গুরুত্ব প্রদান করত। বাকুর বিপুল তৈল এবং জ্বালানি সম্পদ নবগঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এছাড়া মুসলিম বিশ্বে সোভিয়েত প্রভাব বৃদ্ধি করার জন্য শিয়া মুসলিম

অধ্যুষিত আজেরবাইজানকে তুষ্ট রাখা সোভিয়েতের পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় ছিল।
৪) আর্মেনিয়ার চেয়ে আজেরবাইজানে বলশেভিকদের প্রভাব ছিল বেশি এবং সেখানে আধিপত্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাদের বিশেষ কোন বাঁধার সম্মুখীন হতে হয়নি। অপরদিকে আর্মেনিয়াতে বলশেভিকরা ব্যাপক প্রতিরোধের সামনে পড়ায় মস্কোর নেতৃত্ববৃন্দ আজেরবাইজানের ওপর বিশেষ সহানুভূতিশীল ছিল।
৫) আর্মেনিয়াতে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহে জেরবার হতে থাকা বলশেভিক নেতৃবর্গ মস্কোতে আজেরবাইজানি বলশেভিকদের মতো তাদের পক্ষে জোরালো সমর্থকগোষ্ঠী গড়ে তুলতে পারেননি। আজেরবাইজানের নরিমান নরিমানভের মতো প্রভাবশালী নেতৃত্বও আর্মেনীয়দের ছিলনা, যে সোভিয়েত নেতাদের নিকটে তাদের সপক্ষে দরবার করবে।
৬) কারাবাখকে আজেরবাইজানের অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে সোভিয়েত রাশিয়া আজেরবাইজানিদের চিরস্থায়ী মিত্ররাষ্ট্র তুরস্ককে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছিল। মুস্তাফা কামালের নেতৃত্বে তুরস্কে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী সরকারের প্রতিষ্ঠায় সোভিয়েত রাশিয়া উল্লসিত ছিল এবং তুর্কিদের সআথে একটি ভ্রাতৃত্ব চুক্তি সাক্ষরের মাধ্যমে তাদের সাথে সুসম্পরক গড়ে তলে। তুর্কিদের জাতিগত সাদৃশ্যপূর্ণ আজেরবাইজানিদের পক্ষে কারাবাখের অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং তুর্কিদের শ্ত্রু বলে চিহ্নিত আর্মেনীয়দের তা থেকে বঞ্চিত করলে কূটনৈতিক সাফল্য পাওয়া যাবে বলে আশা করেছিল রাশিয়া।
৭) অনেকের ধারণা, Divide and Rule নীতির সার্থক প্রয়োগ ঘটিয়ে আর্মেনীয় এবং আজেরবাইজানিদের মধ্যে চিরস্থায়ী বিদ্বেষের বীজ বুনেছিলেন জোসেফ স্তালিন।

কারাবাখ আজেরবাইজানের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার পর নিম্ন কারাবাখ সম্পূর্ণভাবে আজেরবাইজানি মুল ভূখণ্ডের সাথে মিশে যায়। এবং পার্বত্য কারাবাখ বা নগর্নো-কারাবাখ, ৪,৪০০ বর্গকিমির একটি ভূখণ্ড, আজেরবাইজানের বুকে একটি স্বশাসিত আর্মেনীয় ভূখণ্ড হিসাবে থেকে যায়। নগর্নো-কারাবাখ, রাজধানী স্টেপনাকার্ট।
সোভিয়েত প্রচেষ্টায় আর্মেনীয় এবং আজেরবাইজানিদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপনের প্রচেষ্টা করা হয় এবং দীর্ঘ সময় ধরে এই সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বজায় ছিল। বহু সংখ্যক আর্মেনীয় এই সময় আজেরবাইজানে এবং বহু আজেরবাইজানি আর্মেনিয়াতে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু সত্তরের দশক থেকেই সোভিয়েত ইউনিয়নে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অবক্ষয় দেখা দিতে শুরু করলে দক্ষিণ ককেশাসে উগ্র স্বজাত্যবোধ পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। আজেরবাইজানে অবস্থিত আর্মেনীয় অধ্যুষিত নগর্নো-কারাবাখের বাসিন্দারা দাবী করতে শুরু করে আজেরবাইজান সরকার বলপূর্বক কারাবাখের 'আজেরিকরণ' শুরু করেছে।

সোভিয়েত প্রিমিয়ার মিখাইল গর্বাচেভের আমলে 'গ্লাসনস্ত' নীতির আরম্ভে আর্মেনীয় জনগণ নগর্নো-কারাবাখের আর্মেনিয়ার সাথে সংযুক্তির দাবীতে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৮৮ সালে নগর্নো-কারাবাখের বাসিন্দারা গণভোটের মাধ্যমে আর্মেনিয়ার সাথে সংযুক্তিকরণের দাবী জানিয়ে মস্কোকে অনুরোধ করে। আজেরবাইজান সরকার এর তীব্র বিরোধিতা করে এবং এর সাথে সাথেই পুনরায় আর্মেনীয়-আজেরবাইজানিদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় ভয়াবহ জাতিবিদ্বেষী দাঙ্গা। ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আজেরবাইজানি শহর সুমগাইতে বসবাসকারী আর্মেনীয়দের উপর আক্রোশ নেমে আসে এবং ৩২ থেকে ২০০ জন আর্মেনীয় নিহত হন; অনুরূপ ভাবে গাঞ্জা শহরে ১৩০ জন এবং ১৯৯০ সালের জানুয়ারি মাসে রাজধানী বাকু শহরে ৪৮ থেকে ৯০ জন আর্মেনীয় নিহত হয়, বহুজন আহত হয় এবং প্রায় ২ লক্ষ আর্মেনীয় বাকু ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। একই ভাবে আর্মেনিয়াতে বসবাসরত আজেরবাইজানি নাগরিকরা চরম সহিংসতার শিকার হয়ে দলে দলে আর্মেনিয়া ত্যাগ করতে থাকেন। এই পর্যায়ে ঘটে যাওয়া প্রায় সকল হিংসাত্মক পরিস্থিতিতেই মস্কো থেকে সেনা পাঠিয়ে পরিস্থিতি সামাল দিতে হয়।

ইতিমধ্যে সোভিয়েত নামক মহীরুহের পতন আসন্ন হয়ে উঠলে আর্মেনিয়াতে জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদীরা ১৯৯০ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে নিজেদের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করলেও তা মস্কো কর্তৃক স্বীকৃত হয় না। ১৯৯১ সালে আরেকটি নির্বাচনে দেশের জনসংখ্যার ৯৪% সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পক্ষে রায় দেয় এবং অবশেষে ২৩শে সেপ্টেম্বর আর্মেনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করে। খানিকটা একই সাথে আজেরবাইজানেও জাতীয়তাবাদীরা এই সময় নিজেদের স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন ঘটে।

নগর্নো-কারাবাখের আর্মেনীয় কর্তৃপক্ষ আর্মেনিয়ার সরকারের মদতে আজেরবাইজান থেকে বিচ্ছেদের ঘোষণা করে। এবং ১৯৯১ সালের শেষ দিকে জাতিগত দাঙ্গা দুই সার্বভৌম সদ্য স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে পুরোদমে যুদ্ধের আকার নেয়। দুই দেশের সরকারই এই নগর্নো-কারাবাখের অধিকারের সংগ্রামকে নিজেদের গদি টিকিয়ে রাখার একমাত্র অস্ত্র হিসাবে দেখা আরম্ভ করে। সুসংগঠিত, শৃঙ্খলাবদ্ধ এবং দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ আর্মেনীয় সেনারা এবং পার্বত্য কারাবাখের জনগণ আজেরবাইজানিদের ওপর চরম আঘাত নামিয়ে আনে। আর্মেনীয় স্বেচ্ছাসেবকরা আর্মেনিয়ার মুল ভূখণ্ড থেকে কারাবাখ পর্যন্ত সংযোগ রেখা সৃষ্টি করতে সফল হয়। আর্মেনীয় সেনা ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারিতে খোজালি শহরে ৬০০ এর ওপর বেসামরিক আজেরবাইজানিকে খুন করলে যুদ্ধের গতি ত্বরান্বিত হয়। এর পাল্টা এপ্রিল মাসেই আজেরবাইজানি সেনারা মারাগাতে ১০০ জন বেসামরিক আর্মেনীয়কে খুন করে। এই বছরের শুরুর দিকেই নগর্নো-কারাবাখ স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং আজেরবাইজান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আর্মেনিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যুক্ত 'আর্টসাখ প্রজাতন্ত্রের' সৃষ্টি করে। আর্মেনীয় সেনা এবং স্বেচ্ছাসেবকরা প্রায় সম্পূর্ণ নগর্নো-কারাবাখ এবং

আর্মেনিয়া ও স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের সংযোগের জন্য দক্ষিণ পশ্চিম আজেরবাইজানের সাতটি জেলা দখল করে নেয়। ১৯৯৪ সালে রাশিয়ান ফেডারেশনের মধ্যস্থতায় আজেরবাইজান, আর্মেনিয়া এবং আর্টসাখ প্রজাতন্ত্রের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সাক্ষরিত হয়, ততদিনে দক্ষিণ ককেশাসের ভূমিতে চলে গেছে প্রায় ৩০,০০০ প্রাণ। আর্টসাখ প্রজাতন্ত্র আন্তর্জাতিক ভাবে স্বীকৃতি না পেলেও আর্মেনিয়ার সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলেছে এবং বর্তমানে এর আয়তন ৭,০০০ বর্গকিমি।

যুদ্ধ তো থামল কিন্তু জাতিগত বিদ্বেষ অবসানের কোনো উপায় রইলনা। আর্মেনিয়ার তিনগুণ জনসংখ্যা নিয়েও আজেরবাইজানের এই যুদ্ধে পরাজয় আজেরবাইজানে অস্থিরতার সূচনা করে, দেশ এগিয়ে যায় গণতন্ত্রের মুখোশে সামরিক একনায়কতন্ত্রের দিকে। এই যুদ্ধের পরিস্থিতিতেই আর্মেনিয়াতে চরম অর্থনৈতিক দূরাবস্থার সৃষ্টি হয়, যা থেকে বেরিয়ে আসতে দেশের জনসাধারণকে কঠোর পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।
আর্মেনীয় এবং আজেরবাইজানি উভয় জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে একে অপরের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা। একটি ঘটনা থেকে বিষয়টির সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে। ২০০৪ সালে NATO তার অ-সদস্য দেশগুলির সেনাবাহিনীর জন্য একটি তিন মাসের ইংরেজি ভাষা শিক্ষার কোর্সের আয়োজন করে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্টে। কোর্স চলাকালীন এক আজেরবাইজানি সেনা অফিসার রামিল সাফারভ, একই কোর্সে অংশ নিতে আসা আর্মেনীয় সেনা অফিসার গুরগেন মার্কারিয়ানকে ঘুমন্ত অবস্থায় কুঠারের কোপ মেরে হত্যা করেন। আরেক আর্মেনীয় অফিসার হায়াক মাকুচিয়ান কোনোমতে উন্মত্ত রামিলের হাত থেকে রক্ষা পান। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে রামিল সাফারভের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলেও ২০১২ সালে হাঙ্গেরি তাকে তার বাকি কারাদণ্ড সম্পূর্ণ করার জন্য স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেও রামিল স্বদেশে ফেরা মাত্রই, প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ তাকে সম্পূর্ণ ক্ষমা করে তো দেনই, সাথে বিনামূল্যে বাসস্থান এবং সকল পাওনা মাইনে মিটিয়ে দেন। সেনাবাহিনীতে পদোন্নতি লাভ করা রামিল তার দেশে বীরের অভ্যর্থনা ও সম্মান পান, বিদেশমন্ত্রক নিঃসঙ্কোচে বিবৃতি দেয়, 'দেশের সম্মান এবং শৌর্য রক্ষা করার পরেই রামিল কারাবাস করছিলেন।' নিঃসন্দেহে এই ঘটনা আর্মেনিয়ার সাথে আজেরবাইজানের সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটায়।
নগর্নো-কারাবাখের বিতর্কিত সীমান্ত বরাবর সংঘর্ষ কখনোই থামেনি। সংঘর্ষ চলেছে কখনো মাঝারি স্তরে, কখনো বা তা আন্তর্জাতিক দৃষ্টিসীমার গোচরে এসেছে। আর্মেনিয়ার সরকার এবং আজেরবাইজানের একনায়ক ইলহাম আলিয়েভের মধ্যে বেশ কয়েকবার শান্তি আলোচনাও হয়েছে। একবিংশ শতকের মধ্যভাগে উভয় পক্ষ মাদ্রিদ প্রিন্সিপাল মেনে চলার সিদ্ধান্ত নেয়; আর্মেনিয়া দখলকৃত ভূমির কিছু অংশ আজেরবাইজানকে ফিরিয়ে দেয়, ঘরছাড়া বহু

পরিবার ঘরে ফেরে এবং আর্টসাখ প্রজাতন্ত্রের বাসিন্দাদের নাগরিক অধিকার রক্ষার সিদ্ধান্তকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। কিন্তু যখন দুই দেশেই রাজনীতিকদের ক্ষমতায় টিকে থাকার অন্যতম অস্ত্র এই বিতর্কিত ভুমিভাগের অধিকার সংক্রান্ত কার্যাবলী, তখন সমস্যার সমাধান হবে এটা আশা করাই ভুল।

২০২০ সালের ২৮শে সেপ্টেম্বর, এই কিছুদিন আগে শুরু হয়েছে পুনরায় দুই দেশের সীমান্ত সংঘর্ষ। আর্মেনিয়া এবং আর্টসাখ প্রজাতন্ত্রের দাবী অনুযায়ী চুক্তি লঙ্ঘন করে সীমান্ত বরাবর শেলিং করেছে আজেরবাইজান; যথারীতি এই দাবী নস্যাৎ করে আর্মেনিয়ার আগ্রাসী নীতিকেই দায়ী করেছে আজেরবাইজান। আজেরবাইজানি আগ্রাসনের সম্মুখে আওতায় এসে গেছে নগর্নো-কারাবাখের রাজধানী স্টেপনাকার্ট, অন্যদিকে আর্মেনিয়ার মিসাইলের আওতায় চলে এসেছে আজেরবাইজানের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর গাঞ্জা। ইতিমধ্যেই প্রায় ৩০০ জন সামরিক ও বেসামরিক জনগণ নিহত হয়েছে বলে খবর, সংখ্যা আর বেশি বই কম হবেনা।

এই ককেশীয় প্রতিবেশীদের যুদ্ধে ইতিমধ্যেই চাপানউতোর শুরু হয়ে গেছে বিশ্বের অন্যান্য শক্তিধর দেশগুলির অলিন্দে। আর্মেনিয়ার সাথে চিরকাল শীতল সম্পর্ক রেখে চলা তুরস্ক যথারীতি ভাবে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তাদের পুরনো বন্ধু আজেরবাইজানের পাশে। তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিচেপ তাইয়েপ এরদোগান খোলাখুলি জানিয়েছেন যে তারা নিঃস্বার্থ ভাবে আজেরবাইজানের পাশে আছে। বাকু-তবিলিসি-সেইহান পেট্রোলিয়াম পাইপলাইন আজেরবাইজানের সাথে তুরস্কের সম্পর্ককে অন্যমাত্রায় নিয়ে গেছে। আর্মেনিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধকালীন গণহত্যার জন্য তুরস্ককে সর্বান্তকরণে দায়ী করে তাদের ক্ষমাপ্রার্থনার দাবী জানিয়ে আসছে বহুকাল ধরে, কিন্তু তুরস্ক যথারীতিভাবে গণহত্যার দায় অস্বীকার করে আসছে। আর্মেনিয়ার ক্রমাগত চেষ্টার ফলে ফ্রান্স, জার্মানি এবং পোপ ফ্রান্সিস আর্মেনীয় গণহত্যার জন্য তুরস্ককে দায়ী করে বিবৃতি দিলে তুরস্কের সাথে আর্মেনিয়ার সম্পর্কের চূড়ান্ত অবনতি ঘটে। ২০০৯ সাল থেকে সম্পর্কের উন্নতি ঘটানো এবং বাণিজ্যিক সম্পর্ক চালু করার চেষ্টা দু তরফে হলেও তুরস্কের দাদাগিরি করার অভিযোগ জানিয়ে আর্মেনিয়া সেই চেষ্টা বন্ধ করে দেয়। বর্তমানে তুরস্ক আজেরবাইজানকে উন্নতমানের যুদ্ধাস্ত্র, আধুনিক যুদ্ধবিমান সরবরাহ করে সাহায্য করছে। আর্মেনিয়া দাবী করেছে তাদের একটি সুখোই-৩০ বিমানকে ধ্বংস করেছে তুর্কি এফ-১৬ ফাইটার জেট। যথারীতি দাবী অস্বীকার করেছে তুরস্ক। ইতিমধ্যেই তুর্কি বিদেশমন্ত্রী মেলভুট কাভুসগ্লু বিবৃতি দিয়েছেন, গোটা বিশ্বের উচিত এই যুদ্ধে আজেরবাইজানকে সমর্থন করা উচিত, কারণ তারাই রয়েছে সত্যের পক্ষে। রাষ্ট্রসঙ্ঘে আর্মেনিয়ান দূত মাহের মারগেনিয়ান বলেছেন, আর্মেনিয়া আর একবার তুর্কি মদতে তাদের দেশের অধিবাসীদের গণহত্যা রুখতে যেটা করণীয় সেটাই করবে।

যদিও ভূ-রাজনীতিতে ধর্মের ভূমিকা খুবই কম এবং এই ক্ষেত্রেও অদ্ভুত ভাবে আজেরবাইজানের অন্যতম অস্ত্র সরবরাহকারী ইজ্রায়েল; তা স্বত্তেও দুটি

ধর্মনিরপেক্ষ দেশের মধ্যে এই যুদ্ধে চলে আসছে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ। কামাল পাশার আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে, মুসলিম বিশ্বের নব্য নেতা হওয়ার লক্ষে এগিয়ে চলা তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিচেপ তাইয়েপ এরদোগান সিরিয়া থেকে পূর্বতন ইসলামিক স্টেটের জঙ্গীদের জিহাদি প্রেরণায় আজেরবাইজানে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাচ্ছেন। বিভিন্ন রাশিয়ান এবং ব্রিটিশ সংগঠন এই ভয়ংকর এবং নিন্দনীয় কাজের যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছে, তুরস্ক ক্রমাগত এই কথা অস্বীকার করে গেলেও। ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী ইমানুয়েল ম্যাক্রন তীব্র ভাষায় তুরস্কের এই ভূমিকার নিন্দা করেছেন। আর্মেনিয়ার দীর্ঘকালীন বন্ধু ভ্লাদিমির পুতিনের রাষ্ট্র রাশিয়ান ফেডারেশন। রাশিয়ার সাথে সামরিক বোঝাপড়ায় আর্মেনিয়ার দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য রয়েছে, রাশিয়া পরিচালিত শুল্ক গ্রুপে যোগদান করে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিরাগভাজনও হয়েছিল আর্মেনিয়া। তবে এখনও অবধি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং অন্যান্য দেশগুলির সাথে সুর মিলিয়ে যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাব আনার দাবীই তুলেছে রাশিয়া। তবে ভবিষ্যতে রাশিয়া আর্মেনিয়ার সপক্ষে এগিয়ে আসবে, এই আশাই রেখেছেন আর্মেনিয়ার প্রধানমন্ত্রী নিকোল পাশনিয়ান।
একটা খবরের সাথেই লেখাটা শেষ করব। আর্মেনিয়ার ডেপুটি বিদেশমন্ত্রী আভেত আডন্ট সংবাদসংস্থা জি নিউজকে দেওয়া একটা সাক্ষাৎকারে দাবী করেন, ১৯৯২ সালের যুদ্ধের মতো এইবারের যুদ্ধেও আজেরবাইজানের মাটিতে তাদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যুদ্ধ করতে পাকিস্তানি সেনার উপস্থিতির আশঙ্কা তারা উড়িয়ে দিতে পারছেন না। উল্লেখ্য, ভারতের বিদেশমন্ত্রকের পক্ষ থেকে অনুরাগ শ্রীবাস্তব যুদ্ধবিরতির এবং অস্ত্রসংবরণের আবেদনই জানিয়েছেন।

(এই লেখাটি ০৭/১০/২০২০ এর মধ্যরাত পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে লেখা।)

সূত্রঃ
বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ও দেশীয় সংবাদপত্র এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক প্রবন্ধ।

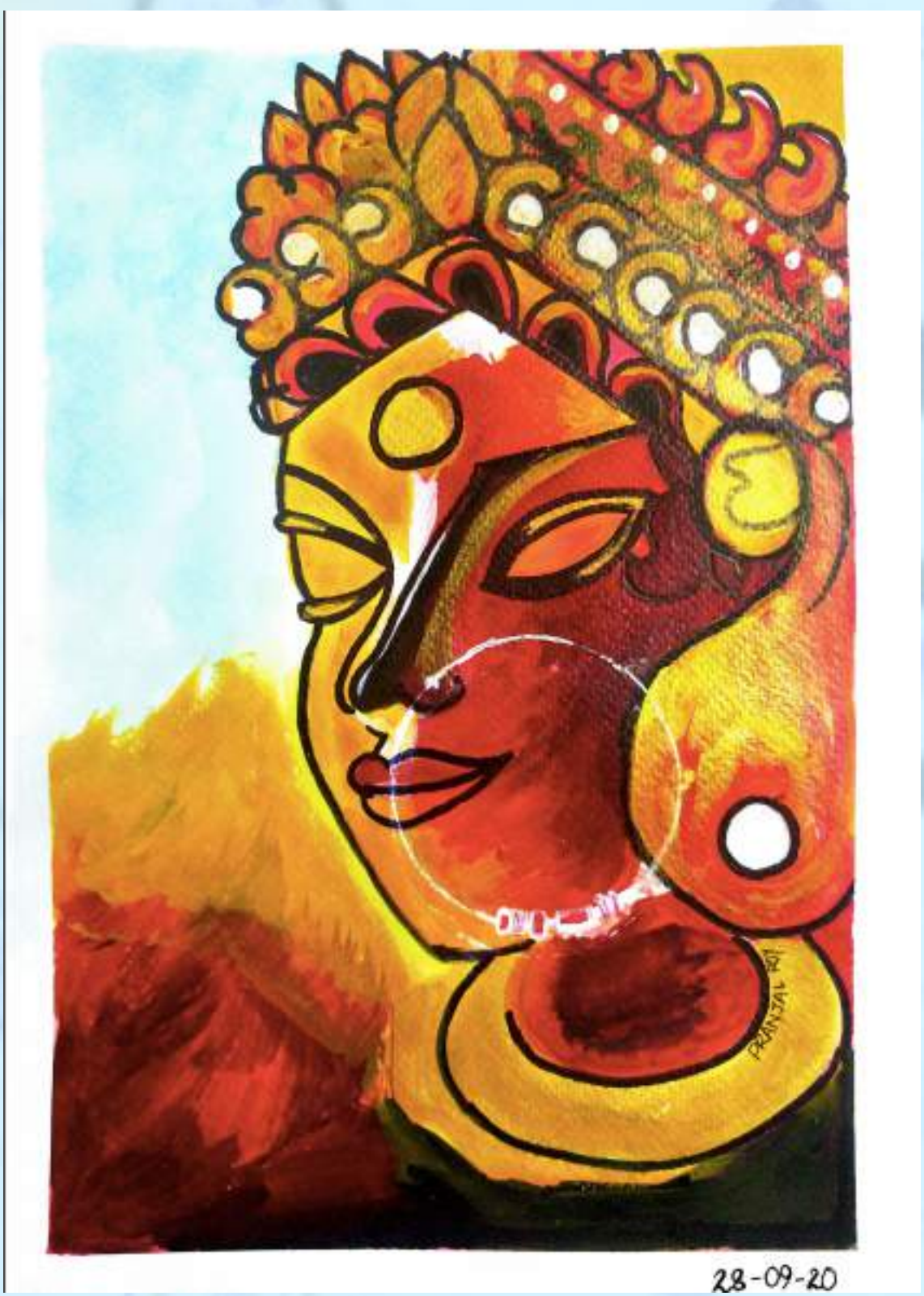


...প্রাঞ্জল রায়

...সুশোভনা ঘোষ

**দ্বন্দ্ব**

## ...শিবতোষ মৃধা

নীলিমারা আর ডাকে না-
সাধ আর সাধ্যের দ্বন্দ্ব বুঝে গেছে ওরা
তাই পিপাসা মেটানোও যেন বাতুলতা।
একদিন কল্লোলিনী ডাক তপস্বীর দ্বারে-
কাঠিন্যের মায়া খেলায় যেন উদভ্রান্ত সে।
দ্বন্দ্বঘাতি চিত্তে পিয়াশার ভীড়;
তবুও ব্যাকুল মানসী, অস্বীকার করে তুলুক তিলোত্তমাকে।
অর্ধশতাব্দীর আর্ত সানাই এখনো স্রোতস্বিনীর চড়ায়,
ভঙ্গুর পাখার ঝাপট সাক্ষ্য বহন করে ততধিক।
যতটা আগন্তুক ভবিষ্যতের অস্তিত্ব জানান দেয়।

একদিন কল্লোলিনী ডাক তপস্বীর দ্বারে-
ললাটে ভদ্রাসনের কলঙ্ক, আর আপ্লুত নৈরাশ্য।
তবুও উচ্চৈঃশ্রবা সীমান্তিনী হ্রেসার কাদন ছাড়ে
এবার লজ্জিত দন্ডেরা বিদ্রোহী, বলে- নির্বাসন দাও;
কিন্তু মৃত অঙ্কুরের তামাশায় লজ্জিত দধীচি
ক্রোধান্বিত দুর্বাসার ন্যায়।

## <u>তৃণসমূহ</u>

# ...কুসুম

১.

বেসামাল তাপদাহে বৃষ্টি আসুক...

ক্রিকেটের মাঠে দূর্যোগের ঘন ঘটা- বৃষ্টি আসুক...

বৃষ্টি আসুক- দারুণ খরায়- তুমুল বৃষ্টি আসুক....

ভেসে যাক- শহর..বন্দর..নগর

আকালের জীবনে-

তুমি আসবে বলেই- কেউ গায়ে শীত মেখে বসে থাকুক।

২.

রাধাচূড়ার শহরে- ফাগুনের বসন্তে বৃক্ষ হই।

...রোদের আগুনে ভেসে,, ঠোঁটে দুপুর নিয়ে- সব পাখিরা আসে- সব পাখিরা যায়।

...একটি পাখি আসুক। ঘুঙ্গুর পায়ে ফাগুনের রঙে একটি পাখি বসুক। এক বসন্তের জীবন নিয়ে একটি পাখি থাকুক।

....একটি পাখি দারুণ জ্বালায়- জ্বলুক- পুড়ুক- মরুক।

....এবার বসন্তেও বৃক্ষ হবো।

৩.

ইহকালে অধিকাংশ মনুষ্যগণের মধ্যে বিদীর্ণ হাহাকার ছাড়া আর কোন অনুভূতি নেই।

ধমনীতে তীব্রতা নেই।

মগজে ও রঙ মহল নেই।
যারা ছিলো তারা নেই।
আত্মীয় স্বজন। মুখস্থ মুখ। মুখস্থ মানুষ। অথবা প্রিয়। নেই।
স্বপ্নের মতো সৌধ নেই। অথবা চাষযোগ্য জমি নেই।
বাসযোগ্য হৃদয় নেই।

৪.
চলতে চলতে থমকে গেছে- রঙিন আলোর দিন... উজ্জ্বল তারার রাত...
প্রবাহমান নদী..তীরে এসে ভেঙে যাওয়া ঢেউ..পথ আর পথের পা...।
ভোর হবে না কোনোদিন।
অথবা ফিরে আসবেনা হলুদ বিকাল।
বরং নৈরাজ্যের শহরে- লোকগুলি ঘুমাক।

৫.
মানুষটা নিরেট বেদনার অনুবাদ..কাটে না ঘুম ঘোর ।
আগুনের আঁচে-হিজলের বনে পুড়ে গেছে তার কবে কোন বেলায় হলুদের দিন।
মানুষটা খুব অসুখ পুষে রাখে...বারোমাস।
জ্বরের কপালে তার আঙুলের হাহাকার।

৬.
"যতটুকু দহন পোষে
ততটুকু আগুন নেই সূর্যের শরীরে।

পথে পথে রক্তক্ষরণ
বুক পকেটে তার বিষন্ন আত্মহনন।

তবুও
এক জীবন
লড়াই ভালোবেসে
মরতে মরতে বেঁচে যাচ্ছে সে বহুবার..."।

...সুমন মৈত্র

...পায়েল দাস

...পায়েল দাস

SUSHANT
#JUSTICE FOR SSR
GIVE ME JUSTICE
I DIDN'T WANTED TO DIE
I WAS MURDERED
THEY HARMED ME
A Man With Big DREAMS
SEBANTI

...সেবন্তী ভট্টাচার্য

# গন্ধ

## ...অনির্বাণ মান্না

মা,জানিস?ভালোবাসার গন্ধটুকু ঠিক কেমন হয়!
নভেম্বরের ফিরতি পথের,সিরামে মাখা চাদরটায় উষ্ণতা টুকুর একদম আড়ালে  লুকিয়ে রাখা একটা ছোট্ট মেয়ের বুকভরা অভিমান আর অনেকখানি জেদের একদম শেষে,একটা শিউলি গাছের নিচে!

ওখান দিয়ে গেলেই,দেখেছি!একটা মিষ্টি গন্ধের পাশাপাশি একটা মিষ্টি প্রেমিক যুগলের একের অপরের হাতে হাত রেখে,ফুলগাছটার দিকে তাকিয়ে এবং হাসিমুখেই একের-অপরের জন্য ফুল পাড়তে। এই মিষ্টি প্রতিযোগিতার মধ্যেই জানিস,ভালোবাসার ওই গন্ধটা লোকানো থাকে!

আসলে ওরা তো নিজেদের পছন্দ করে,ওরা ওদের প্রেমিক-কে শিউলির সেই শেষ  গন্ধটুকুই প্রথম হাসিতে উপহার দিয়েছে আর! বারংবার উপহার দিতে চায়,ওদের ছোটো একজোড়া হাতে ভালোবাসা সাজিয়ে তাই,ওখানেই ওরা প্রতিবার ভালোবাসার গন্ধটা পাবে ।

...সুমন মৈত্র

# শুরু হবে রোদের জন্মদিন

...মৌসুমী সেন চক্রবর্তী

অনিশ্চয়তার...
শ্যাওলা-ধরা পিছল মাটিতে
পায়ে পায়ে সন্তর্পণতা;
লখিন্দর-বেহুলার....
বিবাহ বাসরকে নিশ্ছিদ্র করার
কী এক দিশাহীন প্রবণতা !

কার জন্য কতটুকু...
সময় রয়েছে আজ মাপা,
খোঁজা দিনভর কালের ডায়েরিতে;
হতাশার জঞ্জালস্তূপে...
বিপন্ন থতমত ভাবনার দল,
নিবু নিবু পিদিমের মুখ-গোঁজা সলতে ।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি...
মরে যাওয়া বাগানের দুমড়ানো বেড়াটার
অতি নগণ্য এক কোণে,
সবার সংগোপনে...
তুচ্ছ নয়নতারা, হাসি চেপে

মেলেছে পাপড়ি এক মনে।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি...
চুইয়ে চুইয়ে পড়েছে দুফোঁটা তেল
পিদিমের খাঁ খাঁ করা বুকে,
অসহায় সলতেটা...
সংকোচে তুলেছে তার মাথা ,
আবার হেসেছে ছোট সুখে।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি...
ভ্যাবাচ্যাকা থমকানো ভাবনারা
আবার ছুটেছে বাধাহীন ,
তখনই বুঝেছি ঠিক...
বেরিয়েছে ঝড়ের গ্রেপ্তারি পরোয়ানা,
শুরু হবে রোদের জন্মদিন।।

## ভীষণ দামী

... সৃজা সর্দার

তোর জন্য রংপেন্সিল, চারলাইনের ছড়া।
তোর জন্য রঙ্গিন খাম,ড্রয়ারে ভরা।
তোর জন্যই একটা দুটো গান বেঁধেছি আমি।
তোর জন্যই ডাকনাম ভীষণ বেনামী।
তোর জন্য শীতের শাল আর বুনছি রঙিন টুপি।
ভোরের গাঢ় কুয়াশায় হাঁটবো আমরা চুপিচুপি।
তোর জন্য রঙিন ঘুড়ি,একটা নীলচে আকাশ।
তুই ছাদের থেকে মুখ বাড়িয়ে আমার দিকে তাকাস।
তোর জন্য ছোট্ট উপহার,তোর শধু "আমি"।
এখন আমার দিনরাতে "তুই" ভীষণ দামী।

## সেই গল্পে

... সৃজা সর্দার

গল্পগানে চলছে অবিরাম,কোথাও যাচ্ছে না তো থেমে
ঘাসের ডগা সমান্তরালভাবে
ভেতর থেকে বাড়ছে ক্রম ক্রমে
রোজ দুখানা শালিখ এসে সেই গল্পই শোনে
বৃষ্টি এলেই পালক ভেজায় নতুন রঙে স্বপ্ন বোনে
ওদের বুঝি প্রথম প্রথম প্রেম জমেছে
বৃষ্টি তখন বিদায় নিয়ে আকাশ জুড়ে মেঘ কমেছে
তাই এখন আলিঙ্গনেই আঁকড়ে থাকে
গা পোড়ানো উষ্ণ রোদে সেই গল্পেই চাদর ঢাকে

...চয়নিকা মন্ডল

# Audio visual page

ভেন্ডার মেয়ে। কণ্ঠ ও কলমে : কনিকা সরকার। সমস্ত খেটে খাওয়া নারীদের জীবন বৃত্তান্ত

https://youtu.be/eLEmVWt_p1E

# একাদশের একাদশ

## ...সায়ক চক্রবর্তী

আজ থেকে ১০৯ বছর আগের এক জুলাই মাস। ফোর্ট উইলিয়ামে মাথা উঁচিয়ে রয়েছে জ্যাক ইউনিয়ন।সাহেবী বুট পিষে দিচ্ছে বাঙালির কলজে।লড়াই চাই,লড়তে হবে,অগ্নিযুগের লেলিহান শিখা উত্তপ্ত করে তুলছে বাঙালীর মগজ।

তৃতীয়বারের জন্য শিল্ডের খেলায় নামল মোহনবাগান অ্যাথেলেটিক্স ক্লাব। খেলা কিসের?এ তো যুদ্ধ!

প্রথম ম্যাচ সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের বিপক্ষে।সাহেবী দল তারা,আগুন তো জ্বলছেই বুকে। একের পর এক বর্শা নিক্ষিপ্ত হল অভীষ্ট লক্ষ্যে।তিন তিনটি গোল জড়িয়ে গেল সেন্ট জেভিয়ার্স এর জালে। গঙ্গার হাওয়ায় জুড়িয়ে যাচ্ছে শরীর,ঘাম গায়ে নির্লিপ্ত ১১ টা মুখ এগিয়ে চলেছে মায়াবী ভবিষ্যতের কারিগর হতে।

সেই শুরু,ক্রমে রেঞ্জার্স এফ সি,এক ম্যাচে তিনটি পেনাল্টি রুখে দিলেন হীরালাল মুখার্জি,উত্তর কলকাতার ব্রাহ্মণ গোরাদের গালে সপাটে চড় কষালেন যেন বারংবার।

কোয়ার্টার ফাইনালেরাইফেল ব্রিগেডকে পুঁতে ফেললেন এশিয়ার সেরা লেফট আউট শিবদাস ভাদুড়ি,কখনও ইনসাইড কাট করে ঢুকছেন ,কখনও সোলো রানে বক্সের ভেতর,জায়গা বদলাচ্ছেন সহোদর বিজয়দাসের

সাথে।পালতোলা নৌকার মাঝি নির্ভুল হিসেবে মিলিয়ে দিচ্ছেন একের পর এক ভবিষ্যৎবাণী।

মিডলসেক্সকেও ধরাশায়ী করলেন "ব্ল্যাক ডেভিল" রাইট ইন অভিলাষ ঘোষ,ময়দানের কালো দৈত্য শিবদাসের মতন জাদুকর নন,তিনি নিখাদ শিকারি কুকুর।গোলের গন্ধ পেলেই পৌঁছে যান বক্সে,চকিতে চমক দিয়ে বল জড়িয়ে দেন জালে।বেগড়বাঁই দেখলে মাঠেই পুঁতে দেন সমস্ত সাদা চামড়ার শাসকের অহংকার।

তারপরে এসেছিল ২৯ শে জুলাই,১৯১১।

"বেপোরোয়া খেলার সাহস,খেলার বিবেক,খেলার নবাব,
আমরাই ভিনদেশীদের বিরুদ্ধে এই দেশের জবাব....."

মাঠে নেমেছিলেন ভারতমাতার ১১ জন সন্তান,সুভাষ বোসের তখন মাত্র ১৪ বছর বয়স,তখনই ভারতের মাটিতে প্রথমবারের মতন ইংরেজদের ভূমিহীন করেছিলেন ১১ জন বাঙালী।
গোলে একমেবদ্বিতীয়ম হীরালাল মুখার্জি,দুই সেন্টার ব্যাক ভুতি সুকুল এবং রেভারেন্ট সুধীর চ্যাটার্জি।
মাঝমাঠে তিন স্তম্ভ দাঁড়িয়ে।মনমোহন মুখার্জি,রাজেন সেনগুপ্ত,এন. রায়।
এবং অ্যাটাকে,লেফট আউট,সোনালি ডানার চিল শিবদাস ভাদুড়ী,পাশেই লেফট ইন সহোদর বিজয়দাস,রাইট আউট খেলছেন কানু রায়,রাইট ইন অভিলাষ ঘোষ,এবং সেন্টার ফরোয়ার্ড হাবুল সরকার।

হাওয়ার্ড, বার্চ,ক্রেসির ইস্ট ইয়র্কশায়ারকে ২-১ গোলে চুরমার করে দেওয়া সবুজ য়েরুন তীর গুলো যখন ময়দানের ঘাসে মিশে যাচ্ছিল, লক্ষাধিক জনতা যেন স্বাধীনতার স্বাদে উন্মত্ত,এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এসে দাঁড়ালেন খ্রিস্টান রেভারেন্ট সুধীর চ্যাটার্জির কাছে।

ফোর্ট উইলিয়ামের মাথায় পতপত করে উড়তে থাকা ইউনিয়ন জ্যাকটির দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে প্রশ্ন করলেন,"সব তো হল,কিন্তু ওটি কবে নামবে?" সুধীর বাবু উত্তর দিয়েছিলেন,"আবার যবে শীল্ড জিতব।"

১৯৪৭ সালে দ্বিতীয় বার শীল্ডজয় করেছিল মোহনবাগান অ্যাথেলেটিক্স ক্লাব।💚❤️

## Audio visual page

...সায়ক চক্রবর্তী [sports revise]

**MohunBaganর স্বদেশী একাদশ**

https://youtu.be/JUputQ_qt9w

# কাঁদবে তুমি সেদিন রে

**...দীপঙ্কর ঘোষ**

হাজার ও আর্তনাদের ভীড়ে
চেয়ার টা শুধু বিদেশ ভ্রমণ করে
ওদিকে, "অভুক্তরা" শুধু খিদের জ্বালায় মরে।

সরকার চলে সরকারের মতো
উদাসীনতা কে ছায়াসঙ্গী করে
অভাগা কৃষকরা ফসলের দাম না পেয়ে শুধু মরে।

মধ্যবিত্ত হওয়ার বোঝা মানে
দুশ্চিন্তার শেষ নেই যে সেখানে
অবসাদের খাঁচায় পড়ে ফাঁসির দড়ি গলায় ধরে।

স্বাধীন ভারতে পরাধীনতার ছায়ায়
সাধারণ মানুষেরা শুধু হা-হা-হা কার করে
ক্ষেপবে যেদিন জনতা, পালাবে তুমি সেদিন রে।

জাতীয় সম্পদের
মর্যাদা তুমি কোথায় রাখলে রে?
সেই তো তুমি মান দিলে "বেসরকারিকরণ" করে রে!

গণতন্ত্রের "চতুর্থ স্তম্ভ" বিকিয়ে গেছে
অর্থের ঘেরাটোপে রে,
তাঁরাও যে ভীত আজ, কাজ হারানোর ভয়ে রে।

গণতন্ত্রের দেশে বিরোধিতা করলে
শুধু "ধমকানি" আর "জেলের ভয়" দেখায় রে
যুব সমাজ জাগবে যেদিন, কাঁদবে তুমি সেদিন রে।

## Audio Visual page

... পার্থপ্রতিম রায়

"দেবী চণ্ডিকা সচেতন চিন্ময়ী, তিনি নিত্যা, তাঁর আদি নেই, তাঁর প্রাকৃত মূর্তি নেই, এই বিশ্বের প্রকাশ তাঁর মূর্তি।"
বিশ্বের প্রতিটি ঘরে মা রূপে তাঁর চিন্ময় প্রকাশ। এই রূপকেই আমার গানের মাধ্যমে প্রকাশ করলাম।

Original singer-Rupankar Bagchi Writer and composer-Kabir Suman
https://drive.google.com/file/d/1L-0h7PgfWMYpbqKcNDk5612WryAw5bE3/view

...সৃজিতা দাস

# Childrens corner

...দীপতাংশু পাল

...সুরঞ্জনা দেবনাথ

## Audio visul page :

...অরিত্র পান্ডা

তোমার অসীমে

কথা ও সুর- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

https://drive.google.com/file/d/1Fw3RM_A7NN8itCgUL5g79iqLjzc4EupW/view

# কল্পতরু

...প্রীতম দাস

তার আর কলমে লেখা আসে না ,
পাতার পর পাতা শূন্যতায় ভরে উঠেছে ,
কোন বিষয়ে আলোকপাত করবে
সেটাও তার ভাবনার বাইরে ,
চিন্তা শক্তি ক্ষীণ হয়ে গেছে।
মানসিক অবসাদ , অনিদ্রা ,
হয়ত তার পিছু ছাড়বেনা কোনদিন ।
তবুও হাতে কলম ধরার পর
কেমন যেন নিজের মধ্যে
শিহরণ জাগে তার ,
যে লেখক একসময় তার ভাবনগুলোর
নতুন জীবন দিয়েছিল ,
সেই লেখকই আজ ক্লান্ত ,
গত এক মাস হল সে তার
পরম প্রিয়জনকে হারিয়েছে ,
গভীর শোক , ব্যথিত হৃদয় ,
তার জীবনের শেষ সম্বলটুকুও বাকি রাখল না !
যার জন্যে তার লেখনীর জগতে এত সুনাম
আজ সেই মানুষটাই তার কাছে আর নেই।

যে ভরসা , আশ্বাস আজ তাকে লেখক করেছে ,
সেই ভরসাহীন জীবনে অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে।
কোনোক্রমে আজ সে একটু হলেও
লেখার চেষ্টা করল ,
পাতার শেষ শব্দটুকুও শুধুমাত্র তাকেই উৎসর্গ করে।
খাতার ওপর আলতো করে রাখা দোয়াত কলম ,
আর কিছু অসমাপ্ত অক্ষর ভেসে উঠছে ,
তাতে লেখা ,

"আমরণ তুমি ছিলে মোর সাথে ,
দিয়ে আপনার শক্তি ,
আজ দেখ আমি নিঃস্ব হয়েছি ,
কলমে ফুরিয়ছে ভক্তি। । "

Anindita Tridha.
18th June 2020.

"একটি নারীর মা হয়ে ওঠা,
এবং
একটি পুরুষের বাবা হয়ে ওঠার ছবি"

স্বামী যখন স্ত্রীর মুখ থেকে প্রথম শোনে, যে তার স্ত্রী 'অন্তঃসত্বা '।
কথাটি শোনামাত্রই তার স্বামীর মনে খেলে যায় সাত-রঙা রামধনুর ছটা ।
সেই নারীটি অপেক্ষা করতে থাকে 9 মাস ধরে, কবে তার শিশু ভূমিষ্ঠ হবে ।
একটি নারীর অপেক্ষা আমরা সবাই মানস চক্ষে দেখতে পাই ,দেখতে পাই ধীরে ধীরে তার ভিতরের ছোট প্রাণের ভূমিষ্ঠ হওয়ার দিকে এগিয়ে যাওয়া।
কিন্তু কখনো দেখতে পাইনা সেই বাবার স্মৃতিকোশে শিশুটির পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে যাওয়া।
আমরা সব সময় বলে থাকি একমাত্র নারীরাই সন্তানের জন্ম দিতে পারে।
এটা কখনো কি ভেবে দেখেছি একটা পুরুষ ও সন্তানের জন্ম দিতে পারে ,হয়তো সেটা মানুষ চোখে দেখা যায় না, হয়তো সেটা সবার চোখের আড়ালে ,
কিন্তু সেটা থাকে তার একান্ত ব্যক্তিগত ,তার একান্ত আপনার; তার স্মৃতিকোশের কুটিরে।
একটি সন্তান জন্মাতে মায়ের অবদান যেমন অতুলনীয়, ..... তেমনি বাবার অবদান অনস্বীকার্য,
একটি নারী যেমন গর্ভবতী হয় তেমনই একটি পুরুষ ও গর্ভবান হয়।
"হয়তো বাবা পেটে ধরতে পারেনা, বুকে তো ধরে"

... অনিন্দ্বিতা মৃধা

...অহনা বেরা

# এই জীবনে

...সোহান ঘোষ

বছর কেটেছে পাঁচ , কেউ পায়নি আঁচ
আমার তোমায় ছাড়ার পরের দিনযাপনের ।
অথচ সময়ে রোজ , চেয়েছ আমার খোঁজ ,
জবাব আমি দিইনি কোনও তোমার ফোনের ।

গুছিয়েছ একা সব , সাজানো ফুলের টব
যত্ন করে রেখেছ আজও , নিঃস্ব হয়েও ।
সমস্ত আমার ভুল , দিয়েছ তাও মাশুল ,
শক্ত এমন কজন হৃদয়ক্ষত বয়েও ?

একা অসম্ভব সামলানো , তুমিও সেটা জানো ;
কিন্তু ফেরার কোনো পথ রাখিনি আমিই নিজে ।
হ্যাঁ , ভুগছি শুধু তাই , মন'কে দিয়েছি দোহাই
গতকালও । আসবে আবার । বলছি কী যে

আমি স্বার্থপরের মতই ; নেই জ্ঞানগম্যি , বোধ ঐ ,
যাতে বুঝি এসব মানায় না আর আমার মুখে ।
তবু চাইছি ফেরত আসো , তুমি অমন ভালোবাসো ,
আগে অসুখ হলে যেমন আমায় টানতে বুকে ।

...

না , আসলে না যে আর , কই কিচ্ছু হারাবার
কথা জানিয়ে যাওনি কাউকে তুমি খুব গোপনেও !

তোমার প্রতি আমার টান , তোমার কষ্ট - অভিমান
আর মিটবেনা ; আমি নিয়েছি মেনে , এই জীবনে ...

...অরুনিমা চৌধুরী

# আগমনী

...বিপাশা দাস

প্রতিবছর এই এক ভিড়,ঘ্যানঘ্যানে প্যানপ্যানে গান,তার মধ্যে এ বছর এই গরম জাস্ট অসহ্য.....

আর নেওয়া সম্ভব নয়,এই বছরই শেষ.....

হঠাৎই ড্রাইবার দাদার ডাকে হুঁশ ফিরলো সৃজনের.....

সৃজন ওরফে সৃজনশীল মুখার্জি..... কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার.....বয়স সাতাশের দোরগোড়ায়.....স্কুল লাইফ থেকেই মেয়েদের হার্টথ্রব সে....শুধু দেখার জন্য নয়,মেধার জন্যও বটে.....

গাড়ি থেকে নেমে ব্যাগটা একপ্রকার ফেলে রেখেই ছুটলো সে....

আগের কথা আগেই সেরে ফেলা ভালো....ওর লন্ডনের চাকরির কথা আজই বাড়িতে জানাতে হবে..... কিন্তু কোথায় কি????দোরগোড়ায় পা দিতে তাকে সবাই এমনভাবে আদিখ্যেতা শুরু করলো, সৃজন তো কিছুই বলতে পারলো না,উল্টে ওর সবটা অসহ্য লাগতে লাগলো.....

কোনোরকম ওই নাগপাশ থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে ক্লান্ত বলে চলে গেল ও নিজের ঘরে.....আজ পঞ্চমী.....নীচে দালানে শাঁখ, কাঁসরের আওয়াজে বোঝাই যাচ্ছে প্রতিমা এসে গেছে....

বাড়ি আসলে ও বেশিরভাগ সময়টাই দরজা বন্ধ করে নিজের ঘরে থাকে.....

প্রতিটা সময়,প্রতি কাজে ও বুঝিয়ে দিতে চায় ওর বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই এই মুখার্জি বাড়ির পুজো,আত্মীয় স্বজনে.....

তাও ঐতিহ্যের দোহাই,প্রতিবছর সেন্টিমেন্টাল ডায়লগ দিয়ে ওকে টেনে আনা হয়.....

ন্যাকামো জাস্ট সব.....

ইসসসসস!!! রাহুলরা কত্ত মজা করছে মানালীতে আর ও এই উত্তর কলকাতার প্যানপ্যানে পুজোয়.....

ভাবতে ভাবতে সৃজন সিগারেটটা মুখে দিতেই দরজায় টোকা...

দাদামনি প্রতিমা এসেছে নীচে

এসো না.....

অন্য কেউ হলে সৃজন দরজা থেকেই ফিরিয়ে দিতো, কিন্তু শুধুমাত্র এই ছোটো বোনের উপর ওর এক আলাদা মায়া আছে..... দাদা,দিদি,ভাই বোন মিলিয়ে ওরা আট জন হলেও একমাত্র ছোটো কাকুর মেয়ে মৃনালী ওকে এত ভালো বোঝে.....

"আয় মিলি, ভিতরে আয়"-- দরজা খুলে দিল সৃজন....

"না না ভিতরে যাবো না তুমি নীচে এসো না....."

"না রে,তুই যা আমি ক্লান্ত ভীষণ"

মিলি কি ভাবলো কে জানে, তারপর ভিতরে এসে সোজা খাটের উপর বসে, হাতটা বাড়িয়ে দিলো সৃজনের দিকে.....

যেন কত গচ্ছিত সম্পদ রাখা সৃজনের কাছে.....

সৃজনও চটপট ব্যাগ থেকে দুটো dairy milk বের করে ওর হাতে দিয়ে দিতেই কি হাসি তার.....

"এই তোর কোন year রে???কি নিয়ে পড়ছিস??"

"উমমমম্ থার্ড, বেঙ্গলি অনার্স"লাস্ট কথাগুলো স্পষ্ট বোঝা গেল না খাওয়ার চোটে.....

এমন সময় একটা মিষ্টি গন্ধে ভরে গেলো ঘরটা.....

মনে হলো দরজার সামনে কেউ দাঁড়িয়ে.....

"মৃনালী নীচে তোকে খুঁজছে সবাই....."

"দাদামনি আসছি গো" মৃনালী এক ছুটে নেমে গেল নীচে আর পড়ে রইলো একটা মিষ্টি রজনীগন্ধার গন্ধ.....

আজ অষ্টমী.....

এই দুদিন ঘরে বসে কাটালেও আজ আর তা হলো না.....

কাল রাতে মিলি এসে কথা নিয়ে গেছে, আজ সৃজনকে অঞ্জলী দিতেই হবে.....

নাকি আত্মীয় স্বজন, পাড়ার সবাই সৃজনকে নিয়ে গুঞ্জন করছে....

যদিও সৃজনের জন্য এটা বেশ উপভোগ্য, তবুও অগত্যা মিলির কথায় আজ নীচে যেতেই হবে.....

সকাল ৭.৩০টার মধ্যে স্নান করে, একটা সাদার ওপর লাল কাজ পাঞ্জাবি পরে তৈরী হয়ে নিল সৃজন..... হয়তো মা থাকলেও আজ.....

ভাবতে পারলো না, নেমে গেল নীচে....

জমিদার আমল থেকে শত বছর পুরানো এই মুখার্জি বাড়ির পুজো উত্তর কলকাতার প্রান বললে চলে.....

লোকের ভিড় দেখে সৃজন একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল,আর ঠিক করলো ওপরে ফিরে যাবে.....

যেমন ভাবা, তেমনি কাজ....

দূর থেকেই প্রনামটা সারতে গেল আর

হঠাৎই ওর চোখ আটকে গেল সরস্বতী মায়ের সামনে বসে থাকা একটা মেয়েকে দেখে.....

আটপৌরে সাদা জামদানি শাড়ি,পা মুড়িয়ে বসে তাও শাড়ি দিয়ে ঢাকা.....

হাল্কা অসংলগ্ন কারনে পায়ে মোটা করে আলতার দাগ স্পষ্ট...পিঠ পর্যন্ত নামা অবাধ্য ভিজে চুলগুলোয় জড়ানো মোটা শিউলির মালা.....

আর হাতে শিউলি ফুলের চুড়ি....

পুরোটা সাজটা যেন সৃজনকে মোহাবিষ্ট করে ফেলেছিল.....

হঠাৎ মিলির ডাকে সে তার হারানো সম্বিৎ ফিরে পেলো.....

"দাদা মনি তোকে কি ফাটাফাটি লাগছে রে.....উফফফ!!!! এমনিতে সারাবছরই তোর সম্বন্ধ আসতে থাকে,আজ তো পুরো ফেটে পড়বে" -- বলে মিলি হাসতে থাকলো.....

অন্যবার এইসব মজা লাগলেও আজ আর সৃজনের এইসবে মন নেই....

তাঁর চোখ একইভাবে আটকে সরস্বতী মায়ের সামনে বসে পদ্ম বাছা মেয়েটার দিকে.....

"মেয়েটা কে রে??"--- সৃজনের হঠাৎই এই প্রশ্নে হকচকিয়ে গেল মিলি.... তারপর দাদার দৃষ্টি অনুসরণ করে বললো....

"ওহ, ও তো আগমনী..... আমাদের দুটো বাড়ির পর ওর বাড়ি.... আমার সাথেই পড়ে..... এবছর সন্ধিপূজা তো ১০ টার মধ্যে হয়ে যাবে,তাই ও ১০৮টা পদ্ম বাছছে.....

এ মা আমাদের তো প্রদীপ ও সাজাতে হবে, দাদা মনি তুই আয় আমি গেলাম" --- বলে মিলি দৌড়ে চলে গেল আগমনীর কাছে.....

আগমনী..... মুখে একবার বিড়বিড় করে নিয়ে অঞ্জলী দিতে এগিয়ে গেল সৃজন.....

নবমীর রাত.....

কাল থেকে অদ্ভুত এক ভালো লাগা আবৃষ্ট করে আছে সৃজনকে.....

আজ মুখার্জি বাড়িতে ভোগ বিতরণ আর তারপর পারিবারিক জলসা.....

সন্ধ্যে থেকে তাই লোকে লোকারণ্য.....

"এই এখানে খিচুড়ি দিয়ে যা"

"তরকারি দে এখানে"

"পায়েসের হাঁড়িটা নামা রে"

হাঁকডাকে কান পাতা দায়.....

আর তার মাঝে একটা প্রজাপতির মতো মেয়ে সাড়া ঘরময় ছুটে বেড়াচ্ছে..... কখনো মিলিকে ডাকচ্ছে, কখনো জ্যাঠাইমার হাত থেকে পায়েস নিয়ে যাচ্ছে, আবার কখনো ভোগ তুলে দিচ্ছে হাতে হাতে.....

আর সৃজন ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে পুরোটাই দেখছে.....

অন্য সময় এই গুলো অসহ্য লাগলেও এই মেয়েটা মুগ্ধ করছে তাকে বারবার.....

ওর সাদা কামিজ, গোলাপী পাটিয়ালী,কানে বড়ো একটা ঝুমকো বারবার মনে ঝড় তুলছে.....

মেয়েটা অসম্ভব সুন্দরী নয়,এর থেকেও বেশি সুন্দরী মেয়েদের ও refused করেছে, তবুও এর মধ্যে যেন এক আলাদা মায়া আছে....

যেন মহামায়ার সকল মায়া একত্রে করে সৃষ্টি এই মেয়েটা.....

হঠাৎ রোহিতের ফোন.....

"ভাই কি মিস করলি রে তুই....তো বল তোর কেমন কাটছে???"

রোহিতকে সব ঘটনা বলে একটা শ্বাস ফেললো সৃজন.....

"এই ব্যাপার??? যা গিয়ে কথা বলে মালটাকে তোল....এই ব্যাপারে তো তোর P.hd. করা....আর তাড়াতাড়ি ফিরে আয়.....আর তো এক সপ্তাহও থাকবি না আমাদের সাথে....."

ফোন টা রেখে সৃজন এগিয়ে গেল আগমনীর দিকে.....

"হাই!!! আমি সৃজন.... সৃজনশীল মুখার্জি.... মিলির দাদামনি"

"হাই আমি আগমনী.... আগমনী সেন"

আগমনীর প্রত্যুত্তরে সৃজন যেন একটু হকচকিয়ে গেল

মেয়েটা যে এইভাবে নিঃসংকোচে প্রত্যুত্তর দেবে ভাবতে পারে নি..... ভেবেছিল একটু ন্যাকামি করবে.....

জানে না কেন কিন্তু কলকাতার সবটাই ওর কাছে একটু বেশি রকমের ন্যাকামো লাগে.....

তারপর একথা ওকথা বলতে বলতে মিলি এসে পড়লো.....

"আগমনী তুই এখানে????এখনি জলসা শুরু হবে চল..... দাদা মনি তুই ও আয়"

আগমনী উঠে গেল..... ফেলে গেল একটা মিষ্টি হাসি আর সেই চেনা রজনীগন্ধার গন্ধ.....

দশমীর সকাল থেকেই ১০০টা কাজ....আজ মা আবার শ্বশুর বাড়িতে ফিরে যাবে..... সকাল থেকেই বাড়ির সবাই ব্যস্ত..... সৃজন সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল ছাদে...

আর ছাদের ঠিক কোনাটায় এক ঝাঁক টিয়ার মতো কচি কলাপাতা রঙের শাড়ি.... চুলে একটা শিউলি ফুলের মালা আর হাতে একটা নীলকন্ঠ পাখি.....কোমল পরশে সেও যেন আজ শান্ত....

"আরে সৃজনদা.... তুমি ছাদে???"

"আমি এই এলাম, নীচে যা কোলাহল..... তুমি কি করছো ছাদে????"

"আমি তো এই নীলকন্ঠ পাখিটা আদর করতে এসেছিলাম.... আজ চলে যাবে তো মায়ের খবর নিয়ে শিবের কাছে....."

"আগমনী-ইইইইইইইই"

জ্যেঠিমনির ডাকে আগমনী আসছি বলে নীলকন্ঠ পাখিটা নিয়ে নীচে নেমে গেল.....

দশমীর পুজো প্রায় শেষের দিকে.....

মিলির ডাকে আর কিছুটা আগমনীর টানে সৃজন নীচে নেমে এল.... দর্পণে মা'কে দর্শন করে জ্যেঠুমনির সাথে উড়িয়ে দিল নীলকন্ঠ পাখি..... সৃজনের আচরনে বাড়ির সবাই অবাক সে সৃজনও বুঝতেই পারছিল ভালোভাবে কিন্তু সৃজনের নজর জুড়ে কেবল আগমনী.....

বিকেলে সিঁদুর খেলা....

সাদা পাঞ্জাবিতে সৃজন.... আয়নায় একবার নিজেকে দেখে--"নাহ এই ছেলেকে কোনো মেয়েই না বলতে পারে না"

আগমনী আজ আটপৌরে একটা লাল সাদা জামদানি, সাথে কানে সাবেকি আমলের ঝুমকো,গলায় হালকা একটা চেন,পায়ে মোটা আলতা আর নুপুর, হাতে একগাছি চুড়ি আর কাঁধের কাছে আলতো এক খোঁপা,আর কপালে গালে ছোঁয়ানো অসংখ্য সিঁদুরের আদর..... কয়েক মূহুর্তের জন্য মনে হলো মা দূর্গা যেন নেমে এসেছে সিঁদুর খেলবে বলে.....

সৃজন যেন পলক ফেলতেই ভুলে গেছিল....

আগমনী বৌদিদের সাথে হাসতে হাসতে নেমে এলো উঠানে.....

জ্যেঠু,বাবা,কাকা, দাদা সবার কপালে সিঁদুরের টিপ পড়িয়ে দিল.....

"আগমনী শোন"

সৃজনের ডাকে থামের কাছে এসে দাঁড়ালো আগমনী.....

ততক্ষণে উঠোন জুড়ে ঢাকের তালে ধুনুচি নাচ.....

"আগমনী,তোকে ভীষণ ভালো লাগে আমার..... বুঝতেই পারছিস কি বলতে চাইছি.....আশা করি তোর উত্তর ও হ্যাঁ হবেই"

"সম্ভব নয় সৃজনদা.... আমার কোনো অনুভূতিই নেই তোমার জন্য....ক্ষমা কোরো" ---- বলে আগমনী চলে গেল সবার সাথে ধুনুচি নাচে যোগ দিতে.....

হয়তো ঘটনাটা ভীষণ ছোটোই, কিন্তু জীবনের প্রথম রিজেক্টশন কি এতই সোজা???? বিস্ফারিত চোখে সৃজন সোজা চলে গেল ঘরে.... সজোরে বন্ধ করে দিল দরজা.....

" ভাই তুই কি নেশা করেছিস????তোকে না বলেছে???? তুই সিরিয়াস???"

রোহিতের কথায় গা আরো বেশি জ্বলে উঠলো সৃজনের..... পৌরষত্বে চরম আঘাত যে এই প্রথম....ও তো ভেবেছিল আগমনী আর অন্যান্য মেয়ের মতোই কিন্তু.....

"ভাই আমি ওকে আমার সামনে দেখতে পারবো না..... আমার সহ্য হচ্ছে না ওর মুখটা....."

"ভাই অপমানের শোধ তো নিতেই হবে..... একটা সামান্য মেয়ে তোকে অপমান করল???এক কাজ কর যে রূপ নিয়ে ওর এত অহংকার, ভেঙে দে ওই অহংকার..... মরতে দে সারাজীবন অসুন্দরের ভীষণ জ্বালায়"

ফোনটা রাখে সৃজন..... কাল বাথরুম পরিষ্কারের পর অনেকটা অ্যাসিড বেঁচে গেছে বলছিল  গোপাল কাকা.....স্টোর রুমে রেখেছে.....

রাত তখন অটটা..... এবার মা গঙ্গা পথে পাড়ি দেবে..... বাড়ি থেকে মিনিট পনেরো দূরে গঙ্গা.....

অন্যদিকে গোপাল কাকাকে ম্যানেজ করে সৃজন অ্যাসিডটা বের করে এনেছে.....

পাঞ্জাবিটা চেঞ্জ করে একটা জামা পড়ে নিল.....

পাড়াটা পেরোলে যে অন্ধকার গলিটা আছে ওখানেই ও ছুঁড়ে দেবে আগমনীর মুখে.....

তারপর চলে যাবে এখান থেকে সারাজীবনের জন্য, কাজের অজুহাতে.....কেউ জানতেও পারবে না কোনোদিন....

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে একগাদা সিঁদুর মেখে বেরিয়ে গেল সৃজন.....

আজ তিনটে বছর কেটে গেছে..... এই তিনটে বছর না আছে পরিবারের সাথে কোনো যোগাযোগ না কিছু..... এই বছর লক্ষ্মীপুজোর দুদিন পর মিলির বিয়ে..... একাধিক অনুরোধে তাই ফিরতে বাধ্য হল আবার সেই উত্তর কলকাতার বাড়িতে.....আজ সপ্তমী..... প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে পুজো, আর রাস্তায় ভিড়..... এই তিনটে বছর ও দূরে থেকে বুঝেছে কলকাতার মায়া,বাড়ির ভালোবাসা আর .....

বাড়ি আসতে আসতে সন্ধ্যে নেমে গেছিল.....

কি মুখে দাঁড়াবে সবার সামনে ভাবতে ভাবতে এগিয়ে গেল সৃজন.....

ওকে দেখে সবাই এগিয়ে এল....

কিছুই পাল্টায় নি,সব যেন একরকম..... শুধু বয়স বেড়েছে এই যা.....

সৃজন চলে গেল নিজের ঘরে..... পোশাক বদলে শুয়ে পড়লো.....কাল অষ্টমী.....

আজ সৃজন নিজেই তৈরি হয়ে নিল..... কমলা রঙের পাঞ্জাবিতে আজ সে সুপুরুষ..... সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল দালানে.... আর নেমেই যেটার জন্য প্রস্তুত ছিল না সেটাই হলো..... কমলা সাদা জামদানি,বড়ো কানপাশা,দু হাতে মোটা দুটো চুড়ি,আর কাঁধের কাছে খোঁপায় শিউলি ফুলের মালা.....

প্রদীপের আলোয় মায়াভরা মুখটা যেন আরও মায়াবী লাগছে.....

পলকের মধ্যে সৃজন ফিরে গেল বিসর্জনের রাতে..... সেই অ্যাসিড হাতে বেরিয়ে যাওয়া..... না সেদিন সে পারেনি আগমনীর বিসর্জন দিতে.....

ফিরে এসেছিল সে নিজের ঘরে.....

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে অ্যাসিডিটা ছুঁড়ে দিয়েছিল আয়নার প্রতিবিম্বের ওপর.....

মায়ের সাথে বিসর্জন দিয়েছিল নিজের কাম, ক্রোধ, হিংসাকে.....

ইমারজেন্সি টিকিট করিয়ে চলে গেছিল ব্যাঙ্গালোর আর এক সপ্তাহের পর চাকরির মেল নিয়ে লন্ডন.....

তারপর এই ৩ বছর কোনো মেয়েই আর তাকে আগমনীর মতো আকৃষ্ট করতে পারে নি....

নিজেকে সামলে নিজের ওপর বিদ্রুপের হাসি দিয়ে এগিয়ে গেল অঞ্জলী দিতে.....

তিন বছর পর আগমনী হঠাৎ সৃজনকে দেখে অবাক হলেও নিজেকে সামলে পুজো সম্পূর্ণ করলো.....

আজ আবার দশমী.....

সৃজনের ভালো লাগলো না দালানে,উঠে এলো ছাদে.....

হঠাৎ সেই রজনীগন্ধার গন্ধে ভরে উঠলো ছাদটা....

"মিলির বিয়ে ও হয়ে গেল, বিয়ে করছো কবে????"

হঠাৎ এ হেন প্রশ্ন ও প্রশ্নদাতা কোনোটার জন্য প্রস্তুত ছিল না সৃজন.....

"করব না, তুমি করছো কবে নাকি হয়ে গেছে???" সৃজনের তখনও আড়ষ্টতা কাটেনি তবুও সে তার আড়ষ্ট চোখ দুটো নিয়ে একবার খুঁজে নিল আগমনীর সিঁথি....

"এতদিন আসো নি কেনো??? সেদিন ও বা কোথায় চলে গেলে তারপর??? ফেসবুকেও কত খুঁজেছি পাই নি..... তারপর শুনলাম তুমি লন্ডনে..... একবারও কি জানিয়ে যাওয়া যেত না????" সৃজনের উত্তর না দিয়েই জিজ্ঞেস করলো.....

সৃজন কি বলবে বুঝতে পারলো না.....

"সৃজনদা ৩ বছর আগে আজকের দিনে কিছু রাগ অভিমানের বৃক্ষ রোপন হয়েছিল এই বাড়ির দালানে,আজ কি মায়ের সাথে তার বিসর্জন হতে পারে????"

মায়ের মৃত্যুর আটবছর পর এই প্রথম সৃজনের চোখ আবার চিকচিক করে উঠলো.....

"পারে আগমনী পারে".....

ঝাঁপিয়ে পড়লো আগমনী সৃজনের বুকে....

সৃজনও বহু আকাঙ্খিত ভালোবাসা পেয়ে মিশে গেল আগমনীর সাথে.....

আজ আবার মায়ের সাথে বিসর্জন হল দুটো মানুষের নিঃসংঙ্গতা,একাকিত্ব আর মান অভিমানের সাত সুর.....

হঠাৎ দূরে কোনো মাইকে বেজে উঠল---- "কতবার ভেবেছিনু আপনা ভুলিয়া/ তোমার চরনে দিব হৃদয় খুলিয়া"

## অদ্ভুত আঁধার

...মহুয়া চক্রবর্তী

অদ্ভুত আঁধার নেমে এসেছে আজ এ পৃথিবীতে

কেমন যেন এক মহা সংগ্রামে আমরা প্রতি মুহূর্তে সামিল হয়েছি
এ সংগ্রাম এ লড়াই শুধুমাত্র বেঁচে থাকার অন্যকে বাঁচতে দেওয়ার
নেই রক্তস্রোত এ যুদ্ধ আজ অন্যরকম বিশ্বযুদ্ধ
ঢাল নেই, নেই অস্ত্রের ঝনঝনা,
এ বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাস লেখা হয়ে যাবে হয়তো কোনোদিন ,
কোনো প্রজন্ম তার সাথে পাতায় পাতায় ছবিতে নথিতে পরিচিত হবে।
সামান্য জীবাণুকণার বিরুদ্ধে উন্নত বিজ্ঞানমনস্ক মানব সভ্যতার লড়াই।
আজ শিক্ষিত অত্যাধুনিক মানুষ কী অসহায় ভাবে বন্দি করে ফেলেছে নিজেকে গৃহকোণে
ভয় !সজন বুঝি বা হারায়...
কখন কি যে হয়ে যায় ।
পৃথিবীর ইতিহাস অনেক মৃত্যু অনেক মহামারী দেখেছে,
তবুও ,তবুও আজকের এই অসহায়ত্ব সামাজিক দূরত্ব বুঝিবা আরো একবার মানবজাতিকে সচেতন করে দিল ।
আজ পশু-পাখি ,গাছ-পালা, কীটপতঙ্গ যেন অবাক বিস্ময়ে স্তব্ধ শহরকে উপহাস করছে ।
হে বিধাতা একী ছলনা তোমার !
অনেক প্রাণ শেষ হয়ে গেছে !
ক্ষমা করো , শান্ত করো ফিরিয়ে দাও কল্লোলিনী কলকাতা। প্রাণ এনে দাও গ্রামের মাটির দাওয়ায় ।
আবার নতুন করে ভাসিয়ে দাও জীবন তরী স্নিগ্ধ নদীর হাওয়ায়...।

...জেবা নাসরিন

# অনাঘ্রাত

...অরিত্র দত্ত

"কিগো !কোথায় তোমরা !" বাড়ি ঢুকে কাউকে দেখতে না পেয়ে সবার আগে সবার আগে এই প্রশ্নটাই মাথায় আসে সুহাসের । ক্লাস ইলেভেনের রেজাল্ট নিয়ে সবে বাড়ি ঢুকেছে সুহাস । সচরাচর রেজাল্টের দিন গুলো কোনদিনই ভালো যায় না ওর। কিন্তু এবার ঘটনাটা একটু আলাদা। তাই রেজাল্ট এক বুক উচ্ছ্বাস নিয়ে তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরে সুহাস ।

" কই কোথাও তো যাওয়ার কথা ছিল না!"

মনে মনে চিন্তা করতে করতে বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকে ফোন কর মাকে। দুবার ফোন করেও মাকে না পেয়ে কপালে আসে সামান্য চিন্তার ভাঁজ। ফোন যায় বাবার কাছে। একইভাবে দুবার রিং হলেও ফোন ধরার কোন লক্ষণ নেই। ক্ষনিকের মধ্যেই সুহাসের আনন্দের দি মাটি করে দিতে থাকে দিতে থাকে চিন্তার দল। কি করবে এবার সেটা মাথায় আসেনা। একবার ভাবে মাসি কে ফোন করে বলবে যে মা-বাবা কেউই ফোন তুলছে না। কিন্তু যখনই মনে পড়ে যে মেসোর চোখের অপারেশন ছিল। তাই নিয়ে মাসি খুবই ব্যস্ত। মাসি কে ফোন করে মাসির চিন্তা বাড়ানোর কোন মানে হয় না। রান্নাঘর থেকে ভাত আর ডিমের ঝোল নিয়ে খেতে খেতে ভাবতে থাকে কি করবে। ভাবনার ব্যাঘাত ঘটায় ফোনটা। হঠাৎ বেজে ওঠে। ' ক্রিং ক্রিং... ক্রিং ক্রিং...' ছুটি ঘরে এসে ফোনটার দিকে তাকিয়ে আপাত স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সুহাস । মা কল ব্যাক করেছে। তবে মুহুর্তের মধ্যে স্বস্তি রাগের চেহারা নেয়।

" কোথায় গিয়ে বসে আছো দুজনে মিলে না বলে! কাউকে ফোনে পাচ্ছিনা! বাড়িতে আমিও থাকি সেটা ভুলে যাও নাকি!"

প্রায় 2 মিনিট ধরে সুহাসের রাগ এর শিকার হয়ে ফোনের ওপার থেকে উত্তর আসে,

" ইমারজেন্সি মিটিং ছিল, তাই ওয়েট করতে পারিনি। রান্নাঘরে দেখ ভাত আর ডিমের ঝোল আছে , খাওয়া-দাওয়া করে নে । আমাদের ফিরতে একটু রাত হবে। এখন রাখছি। মিটিং শেষ হলে আবার ফোন করে নেব। "

রাগ , বিরক্তি , বেদনার একটা সংমিশ্রিত অনুভূতিতে নিজেই ফোনটা কেটে দেয় সুহাস।

" রেজাল্ট কেমন হলো একবার জিজ্ঞাসাও করলো না!!"

জীবনে বরাবরই 60% থেকে 70% নম্বর পেয়ে আসা ছেলেটা প্রথমবার 82% নম্বর পেয়েছে। আর মা-বাবা সেটা জানার প্রয়োজন মনে করলে না। খাওয়া সেরে ঘরে এসে মোবাইলে গান শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে সুহাস।

ঘুম ভাঙলো ফোনের শব্দে। ঘড়িতে তখন সন্ধ্যে ছটা।

" পাস করেছিস?"

বাবার প্রশ্ন যেন মুহুর্তের মধ্যে দুনিয়ার সমস্ত রাগ পুঞ্জিভূত করে দিল সুহাসের মধ্যে।

" কেন ফেল করব ভেবেছিলে?"

" না! যে ক্লাস টেন পর্যন্তই 70% নম্বর পায়নি সে ইলেভেনে কেমন রেজাল্ট করবে সন্দেহ আছে। "

" বাড়ি আসলে বুঝতে পারবে। বাড়ির ঠিকানাটা মনে আছে তো নাকি 14 ঘন্টা যেখানে কাটাও সেটাকেই বাড়ি বানিয়ে নিয়েছো!"

" ইমারজেন্সি মিটিং। কবে শেষ হয়েছে। ফিরছি আমরা এখন। "

" যাক বাড়ি বলে একটা জিনিস আছে সেটা তোমাদের মনে আছে। কি সৌভাগ্য আমার!"

গরম মেজাজ নিয়ে কল কেটে হোয়াটসঅ্যাপ খুলে পৃথার সাথে চ্যাটে মগ্ন হয় সুহাস। পৃথা যে সুহাসের কাছের বন্ধু নাকি আরো বেশি কিছু জানে না কেউই। সারা ক্লাসের মধ্যে একমাত্র পৃথার সাথেই একটু ভালো করে কথা হয় ওর। উত্তর ভাগ্যবশত কেউ কোনদিন জানার ইচ্ছা প্রকাশ করেনি 2 মিডিওকার স্টুডেন্টের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্পর্কে। হয়তো সেই কারণেই ওদের বন্ধুত্বের কোন উন্নতি বা অবনতি কোনটাই হয়নি।

পৃথার সাথে কথা বলে মন মেজাজ ভালো হলে ঘন্টাখানেক পর বেজে ওঠে কলিং বেল। মেইন দরজার চাবি তিন জনের কাছেই এক পিস করে থাকে। দরজা খোলার শব্দ বুঝে যায় যে বাবা মা এসেছে। মোবাইল রেখে বাথরুমে ঢোকে সুহাস। বাবা মা এসে যদি দেখে ছেলে মোবাইল নিয়ে বসে আছে তো শুরু হবে আরেক যুদ্ধ।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে অবাক হয়ে যায় সুহাস । ' এ কি ! এ কে ! একে তো জীবনেও কোনদিন দেখিনি'। প্রথমেই মাথায় আসে চোর। ড্রইং রুমে সুহাসের প্রবেশ যেন অস্বস্তিতে ফেলে দেয় সেই ছোট্ট ছেলেটাকেও। হয়তো আর এ খুঁজে পেলকটু হলেই টেবিলের উপর থেকে ফুলদানি তুলে ছুড়ে মারতো সুহাস। ঘর থেকে মাকে বেরোতে দেখে নিজেকে সামলে নেয়।

" এ কে ?"

" অ্যাডাম। দু তিন মাসের জন্য আমাদের বাড়ীতেই থাকবে। "

কিছুক্ষণের জন্য কি বলবে খুঁজে পাচ্ছিল না সুহাস।

" যাও অ্যাডাম বাথরুম থেকে ফ্রেস হয়ে এসো। "

মায়ের কথাটা শুনে আবার কথা বলার ভাষা খুঁজে পেল সুহাস। এডাল বাথরুমে ঢুকলে সুহাস বলে ওঠে ,

" মানে! কোথা থেকে হাজির করলে!!"

" ঘরে আয় বলছি। " মায়ের ডাকে বাবা-মার বেডরুমে ঢোক সুহাস।

" হোমে ইমিডিয়েটলি জায়গা নেই। দু-তিন মাসের মধ্যে কোথাও একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে। ততদিন একটু সামলে নে সোনা আমার। "

" কোথা থেকে পেলে?"

" বাবাকে একজন ফোন করে বলে ওর কথা। জুভেনাইল থেকে সবে বেরিয়েছে। "

" জুভেনাইল থেকে! গ্রেট! এক্সিলেন্ট!"

মার ঘর থেকে নিজের ঘরে গিয়ে কানে হেডফোন গুঁজে শুয়ে পড়ে সুহাস। না , বাবা-মা কেউ সেদিন রেজাল্ট দেখতে চায়নি। শুধু বলেছিল পরের দিন থেকে অ্যাডাম থাকবে ওর ঘরে ওর সাথে। আর ওর মতামত নেওয়ার প্রয়োজনই মনে করেনি তারা।

অযাচিত জুভেনাইল ফেরত রুমমেট এর সাথে এক সপ্তাহ ভালো করে ঘুম হয়নি সুহাসের । ভয় , রাগ , বিরক্তির সংমিশ্রণ ঘুম কেড়ে নিয়েছিল। না , ঘুম হয়নি 10 বছরের অ্যাডামেরও । চোখ বন্ধ রেখে রাত কাটিয়ে গেছে। অ্যাডাম দীর্ঘ এক সপ্তাহের অনিদ্রার ফল স্বরূপ শরীর খারাপ হয় অ্যাডামের। এক রাতে আসে জ্বর। সেদিন অ্যাডাম শুয়েছিল সুহাসের বাবা মার সাথে। শান্তিতে একটা দিন ঘুমাতে পেরেছিল সুহাস। সারারাত ঘুম হয়নি সুহাসের মার । জেগে বসে ছিলেন ম্যাডামের জন্য। জ্বরের ঘোরে একবার মায়ের হাতটা চেপে ধরেছিল। বেশ কয়েকবার 'মা'- বলে ডেকেছিলো।

নিজের মাকে দেখেনি অ্যাডাম। না , , আসলে দেখেছে, মনে নেই। তিন বছর বয়সে অ্যাডামের বাবা-মা মারা যায় এক অ্যাক্সিডেন্টে। তারপর থেকেই তার ঠাঁই হয় অরফানেজ। দু'বছর আগে সেখান থেকেই সোজা জায়গা হয় জুভেনাইল। কারণটা বাবা-মা জানলেও সুহাস কোনদিন জানার আগ্রহ দেখায়নি। তিনটে মাস কাটলো সে বাঁচে।

একমাস কেটে যাওয়ার পরেও অ্যাডামের জন্য কোনো ব্যবস্থাই করতে পারেনি সুহাসের বাবা-মা। অ্যাডামের হিস্ট্রি দেখে কোনো হোম-ই টাকে জায়গা দিতে রাজি হয়নি। মে মাস। তাই অ্যাডামকে ভর্তি করা হয় সুহাসেরই স্কুলে। ক্লাস সিক্স। তা খানিকটা সুহাসের বাবার অবদানেই । যে পরিমাণ ডোনেশন উনি দেন তাতে করে ফাইল করা স্টুডেন্টস কেও পাস করানোর ক্ষমতা রাখেন। বাড়ি থেকে 15 মিনিট দূরত্বে স্কুল। সুহাস একাই স্কুলে যায় । ফেরার সময় 10 মিনিট পৃথার সাথে আর বাকি 5 মিনিট একাই হেঁটে ফেরে। অ্যাডাম আসার পরও সেটার পরিবর্তন ঘটেনি । বাবা অফিস যাওয়ার সময় অ্যাডামকে স্কুলে ছেড়ে যান , ফেরার সময় একাই ফেরে , তবে সুহাস ফেরার প্রায় আধঘন্টা পরে। এই আধঘন্টা অ্যাডাম কী করে জানার কোনো প্রয়োজন মনে করেনি সুহাস। এই আধঘন্টাই সুহাসের পার্সোনাল টাইম । বাবা -মা দুজনেই কাজে , বাড়িতে সুহাস একা । প্রতিদিন এই আধঘন্টাতেই নিজের যাবতীয় প্রাইভেট কাজ করে সুহাস , তা সে যাই হোক না কেন! দিনের এই আধঘন্টা অ্যাডাম ফ্রী জীবন ।

কেটে যায় আর একটা মাস । অ্যাডামের হিস্টি স্কুলে ছড়াতে বেশি সময় লাগেনি। একমাসে কোনো বন্ধু জোটাতে পারেনি অ্যাডাম। এর আগে ফরমাল এডুকেশন সে তেমন পায়নি ,

শুধু বেসিক কিছু জিনিস শিখেছে। তাই এক মাস ক্লাস করেও কী পর হচ্ছে তার মাথা-মুন্ডু উদ্ধার করতে পারেনা অ্যাডাম। ক্লাসে কেউ কথাও বলে না ওর সাথে। কেনই বা কেউ কথা বলতে যাবে একজন জুভেনাইল ফেরত অনাথের সাথে! এমনই একদিন স্কুলে এসে একাই বসে আছে অ্যাডাম। টিফিন টাইমে একজন বড় দাদা হঠাৎ-ই এসে বলে ,

"তোদের মধ্যে অ্যাডাম কে ? বিমল স্যার ডাকছেন। "

ক্লাসে সবার খাতা নেওয়ার সময় খাতা দিতে গিয়েই অ্যাডাম বুঝেছিল স্যার ওকে পরের দিন বিশাল বকবেন। কিন্তু সেদিনই সোজা টিচার্স রুমে ডেকে পাঠাবেন ভাবেনি ,

"আমিই অ্যাডাম। আসছি।"

"অত ভয় পাওয়ার কী আছে! স্যার কী বাঘ ভাল্লুক নাকি যে তোকে খেয়ে ফেলবে!"

হালকা হাসির চেষ্টা করলেও মুখের মধ্যে কোথায় যেন আটকে যায় সেই হাসি। হয়তো টিচার্স রুমে নিজের কপালে কি আছে সেই চিন্তায় বা হয়ত শেষবার যবে হেসেছিল তার পরিনতি হয় , তা সে একমাত্র অ্যাডামই বলতে পারবে। ভয় ভয় বুকে ঢুকেছিল টিচার্স রুমে। হয়তো বিমল স্যারের মুডটা সেদিন অস্বাভাবিক রকমের ভালো ছিল বা হয়তো বাকি স্টুডেন্ট দের মত তিনিও ম্যাডামের জন্য চিন্তা করার কথা ভেবে দেখেননি। তাই শুধু নিজের খাতা নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে অ্যাডাম।

সেদিন পৃথা স্কুলে আসেনি আর সুহাসেরও বাড়ি ফেরার কোন তাড়া ছিল না। তাই ওর কি মনে হল তা সে একমাত্র ওই বলতে পারবে, তবে হঠাৎই অপেক্ষা করে গেল কখন অ্যাডাম স্কুল থেকে বেরোবে তার জন্য। সুহাসের ক্লাস একতলায়। তাই ছুটির পরে অনেক আগেই বেরিয়ে যেতে পারে, কিন্তু পরিবর্তে একতলায় ক্লাস হওয়ার সুবিধা কি কাজে লাগায় কখন অ্যাডাম সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামবে সেটা দেখার জন্য। দীর্ঘ 10 মিনিট দাঁড়িয়ে থেকে সুহাস যখন যে আর দাঁড়িয়ে না থেকে বাড়ি যাওয়াই ভালো তখনই দেখা পায় অ্যাডামের। ক্লাসের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকার জন্য অ্যাডামের চোখে পড়েনি। প্রতিদিনের মতোই ধীরগতিতে স্কুল থেকে বেরোয় সে। স্কুল শেষ হয়েছে মাত্র 10 মিনিট আগে। আর স্কুল থেকে বাড়ি 15 মিনিটের রাস্তা। তাহলে অ্যাডাম কি করে প্রতিদিন আধঘন্টা পরে বাড়ি ঢোকে তা ভেবে পায়না সুহাস। ভেবেছিলো অ্যাডামকে নিয়ে বাড়ি ফিরবে। তা

সে নিজে ভেবেছিল নাকি বাবা মার কথায় করবে বলেছিল সেটা ভাবনার বিষয়। পরিবর্তে অ্যাডামকে কিছুটা সামনে রেখে পিছন পিছন যেতে থাকে সুহাস।

স্কুল থেকে সুহাসদের বাড়ি মেইনরোড ধরেই সোজা 15 মিনিটের পথ। 10 মিনিট সেই রাস্তায় হেঁটে অ্যাডামকে পৃথার বাড়ির দিকে ঘুরে যেতে দেখে অবাক হয় সুহাস।

" ওদিকে কি আছে!!"

তারপরই হঠাৎ মনে পড়ল পৃথার কথা। পৃথা বলেছিল ওদিকে ওর বাড়ি ছাড়িয়ে আরো পাঁচ দশ মিনিট হাটলে একটা মদের ঠেক পড়বে। জুয়া খেলার চরম আসর ওটা। আস্তে আস্তে সমস্তটাই পরিষ্কার হয়ে আসে সুহাসের কাছে। মনে পড়ে বাবা প্রতিদিনই অ্যাডামকে দশ টাকা করে দেয়। সেই টাকা কোনদিনই ফেরত আসে না। সমস্ত ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সেদিন এতটাই রাগ হয়েছিল যে তৎক্ষণাৎ বাড়ি ফিরে ফোন লাগায় সোশ্যাল সার্ভিসেস কে। নিজের সমস্ত সন্দেহকে ভালোভাবে গুছিয়ে গল্পের আকারে জানায় তাদের তবে নিজের পরিচয়টা গোপন রেখেছিল। পরিচয় : একই স্কুলে ছাত্র।

মুখ হাত পা ধুয়ে খেয়ে ঘরে গিয়ে বসে সুহাস। আর ফোন লাগায় আরও একটা। না, এবার এটা কোন দপ্তরে নয়। বরং ফোন যায় পৃথার কাছে। নিজের এত বড় একটা ইনভেস্টিগেশন কারো সাথে শেয়ার না করে থাকতে পারছিল না সে। সমস্তটাই পৃথাকে জানাই। শুধু সোশ্যাল সার্ভিসেস দপ্তরে কোন করার ব্যাপারটা বাদ দিয়ে যায়। একজন জানলে সবাই জানে এবং তারপর সবাই তাকেই দোষারোপ করবে । তাই খুব ভেবেচিন্তে ওই অংশটা বাদ দিয়ে যায়। খুব মন দিয়ে সব শুনছিল পৃথা । যাতে করে সুহাসের বলার আগ্রহ আরো বেড়ে যায়। সমস্ত টা শুনে পৃথাও প্রচন্ড রেগে যায়। স্বাভাবিক সেটা।

" রিয়েলি!! আই কান্ট বিলিভ দিস!!"

" ভাব তুই শুনেই এরকম করছিস, আর আমি সেই ছেলের সাথে প্রতিদিন থাকছি একই ঘরে। আমিতো ইভেন সোশ্যা... " বলতে গিয়েও সামলে নেয় নিজেকে সুহাস।

"না ! আই মিন ওকে পুরো ফলো না করে কি করে কথাটা বলতে পারি! মাত্র 10 বছরের বাচ্চা ও। প্রতিদিনই স্কুলের পর আমার বাড়ির সামনে থেকে একটা ফুলের থোকা কেনে তারপর যায় সামনের চার্চে । দশ পনের মিনিট পর বেরিয়ে চলে যায় তোদের বাড়ির দিকে। প্রতিদিনই প্রায় জানলা দিয়ে দেখতে পাই আমি। "

সুহাস বাকরুদ্ধ হয়ে যায়। কি বলবে, কি করবে ভেবে পায়না। আর কিছু না বলে ফোনটা রেখে দেয়। হয়তো আস্তে আস্তে বুঝতে পারে কী ভয়ঙ্কর একটা কাজ করে ফেলেছে সে। নিজের ফ্রী জীবনের আনন্দ মুহূর্তের মধ্যেই গায়েব হয়ে যায়। না, জীবনটা হয়তো অ্যাডাম ফ্রীই থাকবে কিন্তু অ্যাডামের জীবনটা হয়তো আর ফ্রি থাকবে না। হয়তো আবার ঠাই হবে জুভেনাইলে।

সেদিন অ্যাডাম বাড়ি ফিরলে সুহাস কিছু বলতে পারেনি অ্যাডামকে। মুখ তুলে তাকাতেও লজ্জা পেয়েছিল। পরের 2 সপ্তাহের মধ্যে সোশ্যাল সার্ভিস থেকে কোন ফোন বা চিঠি না পেয়ে কিছুটা হলেও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সুহাস । জীবনে প্রথমবার হয়তো সরকারের অবহেলায় সে খুশি। তারপর থেকে সুহাসের সাথে অ্যাডামের আস্তে আস্তে ভাব জমতে থাকে। 1 মাস আগে অযাচিত প্রতিদিন এক মাসের মধ্যেই পরিবারের প্রিয় পাত্র হয়ে ওঠে।

সুহাসের বাবা-মাও ম্যাডামের জন্য হোমের খোঁজ ছেড়ে দেন। কোন হোমই জুভেনাইল ফেরত অনাথকে নিতে রাজি নয়। খোঁজ ছেড়ে দেওয়ার জন্য হয়তো আরও একটা কারণ ছিল। অ্যাডামের মধ্যেই নিজেদের দ্বিতীয় সন্তানকে দেখতে পেয়েছিলেন তারা। হ্যাঁ, সুহাসের মা জন্ম দিয়েছিলেন দুই সন্তানের। বড় ছেলে সুহাস, 17 বছর বয়স, বর্তমানে ক্লাস 12 এর ছাত্র। আর 1 ছোট বোন - না তার কোন নাম নেই, নাম দেওয়ার সময় হয়নি। পৃথিবীর আলো দেখেছিল কয়েক সেকেন্ডের জন্য। তারপর থেকেই সুহাসের বাবা-মা তৃতীয় সন্তানের কথা ভাবেন নি কোনদিনই। পরিবর্তে নিজেদের সমস্ত সময় দান করেছিলেন অনাথ আশ্রমের কাজে।

দীর্ঘ এক মাসের ভাব ভালোবাসায় সুহাস অনেক ঘটনার সান্নিধ্যে আসে। জানতে পারে অনেক না জানা কথা, বুঝতে পারে অনেক না বলা কথা। জানতে পারে অ্যাডাম প্রতিদিন চার্চে যায় নিজের মায়ের জন্য প্রে করতে।

" নিজে তো কোনদিন মাকে দেখিনি , শুনেছি অ্যাক্সিডেন্টে মারা গেছে। কোনো ছবিও নেই, তাই জানিও না কেমন দেখতে। তাই প্রে করি। চিনি না , তবু যেখানেই থাক সুখী থাকুক। "

10 বছরের একটা বাচ্চা ছেলের মুখে এরকম কথা অবাক করে দেয় সুহাসকে। একদিন গেছিল ওর সাথে চার্চে স্কুল থেকে ফেরার পথে। মন দিয়ে শুনে ছিল প্রেয়ার।

" জানিনা কোথায় আছো, যেখানেই থাকো এইটুকু জেনে রাখ যে তোমায় দেখি নি ঠিকই তবুও তোমায় আজও সমানভাবে ভালোবাসি। "

ধীরে ধীরে সুহাস জানতে পারে অ্যাডামের আগেরবারের জুভেনাইল যাওয়ার কারণ। খেলছিল এক বন্ধুর সাথে। বাচ্চা মানুষ হাসছিল মন খুলে। এমনই সময় অনাথ আশ্রমের মালিকের ছেলে এসে ভেঙে দেয় তার বন্ধুর খেলনা। মারপিট লেগে যায় দুজনের মধ্যে। এক কর্মচারী ছুটে আসলে দোষ পরে সেই বন্ধুর ঘাড়েই। কারণ সে অনাথ আর অপরজন মালিকের ছেলে। প্রচন্ড মেরেছিল সেই কর্মচারী অ্যাডামের বন্ধুকে। তাই রাগ করে শুধু একবার ধাক্কা মেরে ছিল সেই কর্মচারীকে। না তারপর কি হয়েছিল সেটা জানে না অ্যাডাম। শুধু দেখেছিল সেই মহিলাকে গরিয়ে গরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে পড়তে। তারপর সারাদিন একটা বন্ধ ঘরে কাটিয়েছিল। পরদিন যখন দরজা খোলা হয় তখন 2 পুলিশ অফিসার আর দুজন সোশ্যাল সার্ভিসের লোক ছাড়া কারো দেখা পায়নি। দু'বছর পরে জুভেনাইল থেকে বেরোনোর সময় শুনেছিল এক পুলিশ আরেকজনকে বলছে , " এতোটুকু বাচ্চা ছেলে একজনকে খুন করে কি করে!! দেশের কি অবস্থা!!" তখন অ্যাডাম জানতে পারে কি হয়েছিল দু'বছর আগে সেই দিন।

বাবা-মার থেকে সুহাস পরে জানতে পারে সেই মহিলাটি পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর চোট এর সম্মুখীন হয় এবং পরের দিন সকালে মারা যায়। চোখে সত্যি সেদিন জল এসেছিল সুহাসের। সেই চোখের জল কি কারনে তা অজানা। সেই মহিলা মৃত্যু নাকি অ্যাডামের দুর্ভাগ্য নাকি জীবনের নিষ্ঠুর পরিহাস।

কয়েকদিন পর অ্যাডামের অনুপস্থিতিতে সুহাস বাবা মাকে ডেকে বলে,

" একটা সিরিয়াস রিকোয়েস্ট করব,0 রাখবে ?"

"কী , শুনি আগে??"

"অ্যাডামকে আমরা অ্যাডপ্ট করতে পারিনা? "

কিছুক্ষণের জন্য সুহাসের বাবা-মাও বাকরুদ্ধ হয়ে যান। মৌনতা ভেঙে বাবাই বলেন,

" তুই সত্যিই চাস আমরা অ্যাডামকে অ্যাডপ্ট করি?"

" হ্যাঁ। "

" আমরা ভেবেছিলাম তুই হয়তো সেটা পছন্দ করবি না, তাই আমরা আর দত্তক নেওয়ার কথা ভাবি নি। যখন তুই রাজি তখন তাই হবে। তোর কথা ভেবেই আমরা পিছিয়ে এসেছিলাম। "

খুব খুশি হয়েছিল সুহাস। কোথায় যেন নিজের সেই না পাওয়া ছোট বোনের স্বপ্নটা পূর্ণ হচ্ছিল এক ভাইকে পাওয়ার মধ্যে দিয়ে। 4 তারিখ ছিল অ্যাডামের জন্মদিন। সরকারি কাগজপত্র অন্তত তাই লেখা। তিনজনে মিলে ঠিক করেন আর একটা সপ্তাহ অপেক্ষা করে একেবারে সেই দিনই ওরা অ্যাডামকে জানাবে তাদের ইচ্ছা আর জানতে চাইবে অ্যাডাম আদৌ চায় কিনা ওদের পরিবারের সদস্য হতে।

দেখতে দেখতে কেটে যায় তিনটে দিন। স্কুলে টিফিন টাইমে হঠাৎ সুহাসের চোখে পড়ে অ্যাডামকে ঘিরে ধরে ক্লাস টেনিল কিছু ছেলে কিছু একটা বলছে। কাছে গিয়ে শুনতে পায়,

"... তোর সাহস হয় কি করে!! এরকম একটা ক্রিমিনাল রেকর্ড নিয়ে কি করে স্কুলে ভর্তি হলি ভগবান জানে। আবার তার ওপর ধাক্কা মেরে সরি বলেই চলে যাচ্ছিস। "

অবস্থা বুঝে তৎক্ষণাৎ মধ্যস্থতায় নেমে পড়ে সুহাস।

" সরি তো বলেছে।ছাড় না ভাই।"

" দাদা, তুমি এসবের মধ্যে ঢুক না।জানোনা এ কি জিনিস তাই বলছ"

“আমার ভাই কে তর অপমান করবি আর আমি কিছু বলব না। বাহ রে বাহ। নেক্সট টাইম একটু ভেবে চিনতে কথা বলিস নয়তো তোদের কেই ফল ভুগতে হবে। ”

অ্যাডামের হাত ধরে টেনে সুহাস অ্যাডামকে নিয়ে চলে যায়। নিজের দাদাগিরি দেখাতে পেরে বেজায় খুশি সুহাস। আর নিজের জন্য কেউ প্রথমবার উঠে দাড়িয়েছে দেখে অ্যাডামও হয়তো ভীষণ খুশি হয়েছিল।

"যদি ভবিষ্যতে ওর কোনদিন আর ঝামেলা করে তো আমাকে শুধু একবার জানাবি।"

পরের দিন থেকে স্কুলে আর কোনো ঝামেলাই হয়নি অ্যাডামকে নিয়ে। পরেরদিন তো মনে হয়েছিল যেন আগেরদিন কিছুই হয়ননি। আর দুটো দিন, বেশ ভাল মেজাজেই ছিল সুহাস। দেখতে দেখতে কেটেও যায় দিনটা।

পরের দিন সকালে টিউশন ছিল সুহাসের। আজকের দিনটা কাটলে আর একটা মাত্র দিন পরে থাকে, তারপরই অ্যাডামকে জানানো হবে ভাবতে ভাবতে চলে যায় টিউশনে। চোখে মুখে আনন্দ ধরা পড়ছিল।

ফেরার সময় বাড়ি ঢুকতে গিয়ে দেখেছিল শুধু একটা গাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। ঘরে অ্যাডামকে দেখতে না পেয়ে বাইরে মাকেই জিজ্ঞাস করতে গেল সুহাস,

"ওমা , কিসের গাড়ি ছিল গো ও..."

মেয়ের চোখ মুখ দেখে তখনই সুহাস বুঝেছিল কোনো একটা বিপদ ঘটেছে। প্রথমেই মাথায় আসে বাবার কথা। হাই ব্লাড প্রেসারের রুগী বলে কথা , চিন্তা তো সব সময়ই থাকে। উত্তর তা মা দিতে পারে নি । কিন্তু ঘর থেকে বাবাকে বেরতে দেখে আশ্বস্ত হয় সুহাস। উত্তর তা আসে বাবার থেকেই।

"সোসাল সার্ভিসেস।"

"মানে !!"

মুহূর্তের মধ্যেই আকাশ ভেঙে পরে সুহাসের মাথায়।

"কেউ একটা রিপোর্ট করেছে যে অ্যাডাম নাকি প্রতিদিন মদের ঠেকে গিয়ে জুয়া খেলে। ওর নেশার জন্য নাকি থাকা দুঃসহ হয়ে উঠেছে।"

মুহূর্তের মধ্যে সুহাসের মনে পরে যেতে থাকে সব। মনে পড়ে যায় সেই একমাস আগের সেই বিকালের ফোনের কথা।

“ওনারা বললেন যে মোস্ট প্রবাবলি স্কুলের কোনো গার্ডিয়ান রিপোর্ট করেছে। একমাস আগে একবার আর কালকে একবার।”

“কালকে ? ”

“হ্যাঁ। কালকে স্কুলের কেউ একটা রিপোর্ট করেছে।”

“তো আমরা কিছু করতে পারি না ?”

“না। দায়িত্ব সোসাল সার্ভিসেসের । আমাদের কিচ্ছু করার নেই। আর এক সপ্তাহ পরে হলেও অ্যাডপশনের কাগজ দেখিয়ে কিছু একটা করা যেত।”

“তো এখন ?”

“যে ধরনের রিপোর্ট করা হয়েছে। তাতে করে আবার জুভি তেই ফেরত যেতে হবে । হয়তো সেকেন্ড টাইম ক্রাইম বলে সাজ আঠেরো বছর না হওয়া পর্যন্ত থাকবে। এখনও 9 টা বছর।”

আর কিছু বলেনি সুহাস। আস্তে আস্তে নিজের ঘরে চলে যায়। খাটের ওপর ছড়িয়ে পরে রয়েছে অ্যাডামের বই খাতা স্কুলব্যাগ আর মাটিতে পরে আছে অ্যাডামের একটা ছবি। সুহাসের মাথায় এসেছিল একটাই কথা। ‘কালকে স্কুলের কেও রিপোর্ট করেছিল।’ হয়তো সেটাই সুহাসের সান্তনা পুরস্কার।

**...জেবা নাসরিন**

## ধ্বংস

**...প্রতিক মন্ডল**

বিশাল শহর,
মানুষ আদি-অন্তহীন।
সমুদ্র স্রোতের মত গাড়ি,
শহরটার বুক চিরতে চিরতে
এগোচ্ছে ধারালো ব্লেডের মত।
পথের দুপাশে,
কিছু মধ্যিখানে,
অবৈধ বিক্ষোভকারীর মত

মানুষের অনধিকার প্রবেশ।
খন্ড সংঘর্ষের টুকরো শব্দ,
আর,দোকানির আহবান সুর মিলে
যেন বাঘের গর্জনসম ভয়ঙ্কর।কেউ একটু চুপ করাও,
নাহলে,কানের পর্দা আরো ফাটবে,
বুকটা আরও জোরে কাঁপবে,
এদের চুপ করানো খুব প্রয়োজন।

হটাৎ একটা বিকট শব্দ,
আগের থেকেও উচ্চ,
কিন্তু বিদ্যুৎসম ক্ষণিক
সব শান্ত হল।
কালো রাস্তার বহু উপরে,
নীল আকাশের নীচে,
দুটো যুবক প্লেন,
আজ যেন উড়ছে,
সৃষ্টির অংশীদার হয়ে।

বিকট শব্দের অন্তিম যাত্রা শেষ হল।
আর তাদের পরিণতি?
কেন!তাদের নসিবে যে এখন জান্নাতের মগজধোলাই।

...এঞ্জন চক্রবর্তী

# আড়াই বছর প্রাক্তনী

...সায়নদীপ মন্ডল

স্কুলে থাকাকালীন অনেক আনন্দ, হাসি ,ঠাট্টার সাথে সাথে মারামারি, ঝগড়া,মনোমালিন্য এসবই প্রায় সমান তালে চলত। আজ যে আমার ভালো বন্ধু হিসেবে নতুন রং পেন্সিলটা ধার দিল সেই যে কাল আমার সাথে মারামারি করে 'বড়োআন্টি'( হ্যাঁ,ছোটো বেলায় আমরা Headmistress কে এভাবেই সম্বোধন করতাম)র ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে না তার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। শুধুই তো তাই নয় আরো অনেক প্রকাশ্য এবং অপ্রকাশ্য কারণে ঝগড়া,রাগারাগি লেগেই থাকতো। তার রেশ একটা পিরিয়ড,একটা দিন,সপ্তাহ,মাস,বছর এমনকি বাকি স্কুলজীবন জুড়ে থেকে যেতে পারে। আজ, এই স্কুল ছেড়ে আসবার প্রায় বছর তিনেক বাদে স্কুল নামক সেই চারতলা বিল্ডিংটার কথা ভেবে চোখ বন্ধ করলে শুধুই ভালো স্মৃতিগুলো মনে পড়ে। সেই করিডোরে ছুটতে ছুটতে একসময় দাঁড়িয়ে থেকে গল্প করা, মাঠে খেলতে যাবার তাড়ায় টিফিন খেতে ভুলে যেতে যেতে একসময় টিফিন না নেবার অভ্যাস গড়ে তোলা , সব থেকে রাগি স্যার,ম্যামদের ক্লাসে ভয়ে চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে থাকতে একদিন তাঁদের সাথেই হাসি মুখে গল্প করা ইত্যাদির যে সুখকর স্মৃতিগুলো আমরা সঞ্চয় করেছি, সেগুলোর সামনে ঐ সামান্য ঝগড়া মারামারির ঘটনাগুলো খুবই ক্লিশে মনে হয়।

আমি যেখানে আমার জীবনের এই শ্রেষ্ঠ আটটা বছর পার করেছি সেখানকার সবথেকে প্রিয় স্মৃতিগুলোর প্রায় পঞ্চাশ শতাংশই পেয়েছি প্রতিদিনের একটা তিরিশ মিনিটের টিফিন টাইমে। বাকি সারাদিনেও অনেক অনেক মজার

ঘটনা ঘটত, কিন্তু ঐ তিরিশ মিনিটের প্রতিটা সেকেন্ড আমরা সবাই একবারে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতাম।

আমার মনে আছে ক্লাস ফাইভে ভর্তি হবার পর , আমি একবার দেখেছিলাম বেশ চার, পাঁচজন মিলে গোল হয়ে , ভাগাভাগি করে টিফিন খাচ্ছে। তা আমি মা কে জিজ্ঞেস করতে মা বলল এখন তো তুমি আর আগের মতো ছোটো না, শেয়ার করে তুমি টিফিন খেলে তুমি খুব তাড়াতাড়ি নতুন নতুন বন্ধু বানাতে পারবে। এবার আমি খুবই খেতে ভালোবাসতাম (এখনো খেতে ভালোবাসি) নিজের ভাগের খাবার আমি অন্য কারোর সাথে ভাগ করব এটা কল্পনাতেও আনতাম না, তাই সেভেনে ওঠবার আগে কোনোদিনই কারোর সাথে টিফিন সেই অর্থে শেয়ার করিনি।

সেভেনে ওঠবার পরে হঠাৎ পরিবর্তনের কারণ আছে। সেভেনে ওঠবার পরে মা এর একবার প্রচন্ড শরীর খারাপ হয়, প্রায় মাস খানেকের জন্য। সেজন্য আমাকে বিস্কুট বা সন্দেশ এরম জিনিস টিফিনে নিতে হত। তো বিস্কুট আর সন্দেশ সেই সময় আমার কাছে এক প্রকার অখাদ্য বলে মনে হতো। তাই আমার সেই সময়ের অন্যতম প্রিয় বন্ধু(এর সাথে ফাইভ থেকে নাইন অবধি এক সেকশনে পড়েছি)কে দিয়ে দিতাম। এই সন্দেশ বিস্কুট আমার জীবনে এক প্রকার বিভীষিকার মতো যতোদিন না স্কুলের পরে টিউশনে যেতে শুরু করেছি ততোদিন ছিল।

এই দীর্ঘ আটটি বছর স্কুলে থাকাকালীন আমার কোনোদিন গার্ডিয়ান কল হয়নি। না, সেরম কিছুই করিনি বলাটা ভুল না ঠিক সে বলতে পারব না, তবে অনেকবার হতে গিয়েও হয়নি, কারণ আমি স্কুলে ঐ টিপিকাল বদ ছেলে গুলোর মধ্যে পড়তাম না। একবারই আমাকে অনেক কষ্টে অনেক অজুহাত দিয়ে বাঁচতে হয়েছিল। সেবার শীতে খুব কাবাডির ঝোঁক উঠেছিল সবার ,

নাইনের সাথে এইটের খেলা হচ্ছিল। সাব হিসেবে কে নামবে সেই তর্কাতর্কিতে একজনের সাথে ধস্তাধস্তি হয় আর তার প্যান্ট যায় ছিঁড়ে। তার পরে টিচার্স রুমে সে এক বিশাল ঝড় বয়ে যায় আমার উপর দিয়ে,ইয়া মোটা একটা বেতের লাঠি বের করা হয় আমাকে কয়েক ঘা দেবার জন্য 'আজকে তোর পাছু লাল করেই ছাড়বো', 'ছেড়ে দাও **দা, ওর বাবা মা কে ডাকো', 'আগে দু ঘা দাও, তারপর ওর কথা শোনো'এরম সব শব্দবান ছুটে আসে , (যদিও কোনোটাই হয়নি) তারপর অনেক কষ্টে গার্ডিয়ান কল রদ করা যায় এই শর্তে যে আমি আগামি একমাস মাঠেই যাব না। সেই সময় এটা লিখে সই করতে যে কতোটা কষ্ট হয়েছিল তা বলে বোঝানো যাবে না। এখন মনে পড়লে বা তার সাথে এগুলো বললে দুজনেই খুব হাসাহাসি করি।

আরেকটু পিছিয়ে যাই। ক্লাস সিক্স মনে হয়। একদিন টিফিনে সিআইডি খেলা হচ্ছিল। যাদেরকে ধরতে হবে তাদের মধ্যে একজন করিডোরে টিচার্স রুমের দরজার পর্দার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। কিছুক্ষণ বাদে রুম থেকে বাইরে বেরোতে গিয়ে একজন স্যার ছেলেটিকে দেখতে পায় আর তার কাঁধে টোকা মেরে ডাকে। সে এক লহমায় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে , এই যা না রে, কেনো ডিসটার্ব করছিস, এখন খেলছি তো। আবার টোকা। এবারে ধুর বাবা বলে ঘুরতেই স্যারকে দেখে তার হাত পা পুরো ঠান্ডা। (আসলে স্যারকে আমরা ছোটো বেলায় খুব ভয় করতাম) তারপর খুব গম্ভীর আর ঠান্ডা গলায় স্যার, ' টিচার্স রুমের পর্দার পেছনে লুকিয়ো না, আমাদের যেতে আসতে অসুবিধা হতে পারে। এখন যাও', বলে ওকে সোজা ক্লাসে পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। আমাদের ক্লাসে প্রায় একশোত্রিশ জন ছাত্রছাত্রী ছিল। সবার সাথে আস্তে আস্তে সখ্যতা গড়ে উঠতে উঠতে আমরা বেশ অনেকটাদিন পার করে ফেলেছিলাম।এই টাইম পিরিয়ডটা কেটে যাবার পর থেকে টিফিন টাইমে

আমাদের সব থেকে বড়ো ত্রাস ছিল চশমা পরা পাটকাটির মতো রোগাপটকা একটা ছেলে। ও সব সেকশন ঘুরে ঘুরে ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে সবার টিফিন খেয়ে বেড়াতো। টিফিন খাওয়ার ব্যাপারে এর গতি ছিল দেখবার মতো। যেদিন দু চারজন সাঙ্গোপাঙ্গো জুটল তো জুটল নইলে ও একাই একশো ছিল। কারোর কাছে ও চাইত না গিয়ে।

He be like : ' I come, take my অধিকারের ভাগ with উচ্চ শীর, then go back... No begging... That's how you do it.. you know!'

এই ছেলেটাই পরে বেশ কয়েকবার ছোটো ক্লাসে পড়া আমার এক বোনেরও টিফিন খেয়েছিল ( না এখানে ওরম করেনি, স্বেচ্ছায় দিয়ে যেত)।

আরো অনেকটা বড়ো হবার পর , মানে এগারো বারো ক্লাসে হাতে গোনা কিছুজন প্রতিদিন টিফিন আনতো। তখন টিফিনের বাক্স কমেছিল কিন্তু হাতের সংখ্যা কমেনি। সামনের দিকে যারা বসতো তাদের থেক ভদ্র ভাবে নিলেও শেষের দিকের বেঞ্চগুলোতে এতোটাই হুড়োহুড়ি লাগত যে বেশিরভাগ সময় দেখা যেত আমাদের মুখে যতোটা না খাবার গেল তার থেকে বেশি খাবার বেঞ্চ এর তলায়। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে কেউ একবার মেয়েদের দিকে দেখিয়ে বলেছিল দেখ ওরা কি সুন্দর ভাবে খায়, সবাই মিলেমিশে, ধীরেসুস্থে ,তোরা এতো ছড়াস কেন?। উত্তর এসেছিল ' That's how boys do it'.

এই সময়েও এমন একজন ছিল যে এই টিফিন শিকারীদের দলের হাত থেকে প্রথম দিকের কয়েকদিন টিফিন রক্ষা করতে পেরেছিল। ওর থেকে নিতে গেলেই বলতো ' আমি আজ খেয়ে আসিনি রে, খুব খিদে পেয়েছে, কাল দেবো'। তা রোজ রোজ তো আর এক গল্প দিলে চলে না। একদিন সেই চশমা

পরা ছেলেটার ডাক পড়লো। সে তখন কিছু বাছা বাছা ছেলে মেয়েদের ছাড়া টিফিন খেতো না (না খেতে কেউ বারণ করেনি কিন্তু ঐ বয়সে বিশেষ কোনো এক বা একাধিকের সামনে এসব আর করা যায় না)। পরের দৃশ্যটা কল্পনা করতে হলে হয় এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে নয় খুব ভালো কল্পনা শক্তির অধিকারী হতে হবে (চেষ্টা করো/করুন, পেরে যাবেন), শেষের দিকের তিনটে বেঞ্চের দিকে প্রায় আট দশজন সামনের ঐ রোজ রোজ অজুহাত দেওয়া ছেলেটার দিকে তাকিয়ে আছে। রোগা ছেলেটা গেল , টিফিন তুলে খেল, চলে এল। পেছন থেকে পিলপিল করে এসে পড়ল ছেলের দল,' ওকে দিলি কেন? আমি না তোর বন্ধু , দিবি না? স্ট্যাট ক্লাসে পাশে বসি ,দে! আমি কিন্তু এমসিকিউ বলব না, দে.....' এরম আরো এক ঝাঁক যুক্তির সামনে নিরুপায়ের মতো তাকে তার লুচির কৌটোটাকে দীর্ঘ দশ সেকেন্ডের জন্য হাতবদল হতে দেখতে হল । এইরকম কাড়াকাড়ি ব্যাপারটা নিয়ে লিখতে হলে প্রতিদিনের জন্য আলাদা আলাদা করে লিখতে হয়।

এছাড়াও যেগুলো হতো, না বলে টিফিন বক্স ফাঁকা দেওয়া, ক্লাসে বসে টিফিন খাওয়া, টিফিন খেয়ে টিফিন বক্স লুকিয়ে রাখা এরম বহু দুষ্টুমি। ক্লাসে টিফিন খাওয়া বলতে সবচেয়ে বেশি মনে আসে বায়োলজি প্র্যাকটিকাল ক্লাসে টিফিন খেতে গিয়ে ধরা পড়া। সেদিন আমাদেরকে বলা ছিল তোমরা সবাই ল্যাবে চলে যাবে ওখানেই অ্যাটেনডেন্স নেওয়া হবে। এখন ল্যাব করতে গেলে ব্যাগ রেখে যেতে বলতো, নইলে পাশের কেমিষ্ট্রি ল্যাবের স্টুডেন্টদের সাথে গুলিয়ে যেত, আর ব্যাগ রেখে গেলেই টিফিন হাপিস। তো আমরা কয়েকজন সেদিন ঠিক করলাম টিফিন খেয়ে তবে ল্যাবে যাব। কেউ একজন পরোটা আর ডিমভাজা এনেছিল । একটুকরো পরোটা মুখে দিয়েই দেখি স্যার হঠাৎ করে ক্লাসে এসে গিয়েছেন, অ্যাটেনডেন্সের জন্য( পরে

জেনেছিলাম কোনো একজন সাপ আমাদের টিফিন খাবার পরিকল্পনা ফাঁস করে দেয়) এবার স্যারের সামনে চিবোতেও পারছি না, আর সে পরোটার টুকরোও যেন শক্ত ইট হয়ে গিয়েছে। যথারীতি আমার রোল এসে গিয়েছে, ঢোঁক ওও গেলা যায় না গলায় বাঁধবে, প্রেজেন্ট ও দিতে পারছি না, চোখ মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে, দম আটকে আসছে ,সে এক ভয়ানক বিচ্ছিরি অবস্থা! শেষে পাসের বন্ধুটা ব্যাগের তলায় মুখ নামিয়ে প্রেজেন্ট দিয়ে আমায় উদ্ধার করে। Last but not the least, সব থেকে মনে পড়ে যেটা শুক্রবারের টিফিন টাইমটা। ঐদিন করে আমাদেরকে স্কুল থেকে টিফিন দেওয়া হতো। কোনোদিন মুড়ি চানাচুর শশা পেঁয়াজ কুচি দিয়ে মাখা, আবার কোনোদিন মুড়ি আর বোঁদে। সবাই ঐদিন করে এক রকমের টিফিন খেতাম , সামান্য জিনিস তাও খুব আনন্দের সাথে উপভোগ করতাম। আমাদের এক বন্ধু দুবার করে মুড়ি নিতো, একবার খেয়ে নিয়ে আবার ভরে নিয়ে ব্যাগে রাখত। একবার জিজ্ঞেস করায় গর্বের সাথে বলেছিল, 'জানিস আজকে করে আমার পাড়ার মোড়ের কুকুরগুলো আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে'। এইট নাইন অবধি মনিটররাই মুড়ির গামলা থেকে হাতা কাটিয়ে মুড়ি দিতো, গামলা আনা আর দিয়ে আসার দায়িত্ব ওদেরই ছিল। পরে এই মুড়ি চানাচুর দেবার দিনগুলোতে গামলা কে আনতে যাবে তাই নিয়ে জটলা হতো। কারণ যারা দুজন আনতে যাবে তারা উপরের দিকে থাকা সব চিপস আর কাঠিভাজা গুলো সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময় খেতে খেতে আসতো, তারপরও যেগুলো পড়ে থাকত সেগুলো নিয়ে কাড়াকড়ি বাঁধত। এই চিপস আর কাঠিভাজা যে এত পরিমাণ লোভনীয় আর দুর্লভ ছিল তখন যে ক্লাস সিক্সে পড়াকালীন আমাকে একজন জোর করে স্যারের কাছে নিয়ে গেছিল। আমার অপরাধ ছিল আমি তার থেকে একটুকরো কাঠিভাজা তুলে খেয়ে নিয়েছিলাম।

এছাড়াও একা একা একটা এগরোল খাওয়ার জন্য একজন সারা স্কুল ঘুরে বেড়ানো , একজন সিঙ্গারা খেতে গিয়ে নাক দিকে সিঙ্গারা বের করে ফেলেছিল, দুধপুলি এনে সমস্ত বই খাতায় দুধ মাখিয়ে ফেলেছিল, টিফিন বক্সের জন্য সারা মাঠ দৌড় করানো এরম হাজার হাজার টুকরো টুকরো স্মৃতি এখনো মনের মধ্যে জ্বলজ্বল করছে। আসলে ভয় ভয় করে স্কুলে যেতে যেতে আমরা নিজেদের অজান্তে কখন স্কুলটাকে ভালোবেসে ফেলেছিলাম নিজেরাই বুঝিনি। আর বোধহয় এই ভালোবাসার টানেই এই আড়াই বছর প্রাক্তনী হয়ে যাবার পরেও স্কুল বা আমরা কেউই কাউকে এখনো দুরে সরিয়ে ফেলতে পারিনি।

...এঞ্জন চক্রবর্তী

# সেবকের পথে

...রীতা ঘোষাল

জলপাইগুড়ি থেকে দেড়ঘন্টার পথ। শিলিগুড়ি হয়ে উত্তর দিকে যেতে হয়। এই শহরটি পেরোলেই সৌন্দর্য্যের শুরু।দুপাশে সারি সারি গাছ মাঝখান দিয়ে বাস রাস্তা চলে গেছে। গাছগুলো পর পর দাঁড়িয়ে আছে। শাল গাছের সঙ্গে নাম না জানা অন্য গাছও রয়েছে। শিলিগুড়ির তেনজিং নোরগে বাসস্ট্যান্ড থেকে বাসে উঠে প্রায় আধঘন্টার পথ পেরিয়ে আমরা পৌঁছলাম সেবকের কালীমন্দিরের নিকট। অবশ্য পাহাড় শুরু হয়ে গেছে একটু আগেই। পাহাড় কেটে তৈরী করা হয়েছে এই মন্দির। এতো মানুষের তৈরী। কালীমন্দিরের পাশেই সেবক করনেশন ব্রিজ। ওটাই এখানে তিস্তার ওপারে যাবার রাস্তা। ব্রিজ থেকে নিচের দিকে তাকালে দেখা যাবে প্রায় পঞ্চাশ ফুট নীচে শান্ত ধীর গতিতে বয়ে যাচ্ছে শীতের তিস্তা। তার জল কখনো মনে হবে নীল, আবার কখনো সবুজ। সে এক অদ্ভূত দৃশ্য। দুপাশে উঠে যাওয়া পাহাড় এত বৃহৎ এবং রহস্যময় যে প্রকৃতির এই সৃষ্টিকে প্রণাম জানাতে হয়। আমরা জানি, পাথর কঠিন, ওতে প্রাণের সাড়া নেই। কিন্তু পাহাড়ে গিয়ে দেখতে পাবেন কত নাম না জানা গাছ তার শিকড়ের সাহায্যে পাথরকে আপ্রাণ জড়িয়ে আছে। অবাক হই, এর রহস্য দেখে। তাছাড়া পাহাড়ের পাথরগুলো এমনভাবে বসানো হয়েছে যে তাতে মনে হয় প্রকৃতি দেবী এদের নিজের হাতে পর পর সাজিয়ে দিয়েছেন। আরো অবাক হই মানুষ যেভাবে বিশ্বকর্মার দায়িত্ব নিয়ে পাহাড়কে কেটে রাস্তা করেছে। কালিদাসের স্বপ্নের উজ্জয়িনী, অবন্তী ও বিদিশার মতোই অনেক স্বপ্নের দেশ আজ পাহাড় পর্বত পেরিয়ে মানুষের বাস্তব জীবনের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে। আজকের মানুষের অজানা কিছু নেই। কারণ স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করার ক্ষমতা তার হয়েছে। প্রকৃতিৰ এই যে বিশাল সুন্দর ভয়ঙ্কররূপ একেও মানুষ বশে এনেছে। ব্রিজের পাশেই ধাপে ধাপে সিঁড়ি নেমে গেছে। যদি নদীর ধারে যেতে চান, তার ওই কাকচক্ষু জলকে স্পর্শ করে নিজেকে পবিত্র করতে চান তাহলে আপনাকে প্রায় পঞ্চাশ ফুট নীচে নামতে হবে।উপর থেকে নীচের দিকে অনেকটা প্রায় খাঁড়া। তবে নদীর ঠিক কিনারায় বালির উপর ইতস্ততঃ পাথর ছড়িয়ে আছে। নদীর তীরে জলের কিনারায় সেই পাথরে আপনি বসে বিশ্রাম নিতে পারেন। পাহাড়ি নদীর বুকে বয়ে যাওয়া ঝিরঝিরে শান্ত হাওয়া আপনার মন-প্রাণ জুড়িয়ে দেবে। আপনার মনে হবে, জীবনের বাকি সময়টুকু এখানে কেটে গেলেই ভালো হতো। যদিও মনের মধ্যে একটা হীনমন্যতা বোধ আসে। এই বৃহতের মাঝে নিজেকে বড়ো তুচ্ছ মনেহয়। যাইহোক সাংসারিক বাস্তবতা থেকে একটু রেহাই নব সজীবতায় উদ্বেলিত করে তুলবে। নীচ থেকে উপর দিকে তাকাবেন দেখবেন তাতে সবুজের সমারোহ। আপনার দৃষ্টিকে আরাম দেবে, শান্তি দেবে। সেই সঙ্গে পাখীদের কুজন - একটা মোহময় পরিবেশের সৃষ্টি করে। মাঝে মাঝে বানর-হনুমানের অবস্থান যেন মানুষ ও প্রকৃতির প্রতিযোগিতার দেশে নীরব দর্শক। শহরের কৃত্তিম পরিবেশ থেকে কিছুক্ষনের জন্য প্রকৃতির উদার মুক্ত পরিবেশে এসে হাত-পা ছড়িয়ে একটু নিঃশ্বাস নেওয়া। রোদ ঝলমলে শীতের দুপুর আপনি এখানে কাটাতে পারেন। সূর্য্যের কিরণ নদীর বুকে তৈরী করছে হাজার হাজার সোনার টুকরো। যা ধরতে গেলেই মিলিয়ে যাচ্ছে। অল্প স্রোতে কত কি ভেসে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে কে জানে ! এই পরিবেশে বসে কেবলই ভাবতে ইচ্ছে করে পৌরাণিক শিব-উমা, মেনকা হিমালয়ের সান্নিধ্যে আছি। শিবের সেই বল্কল পড়া কমণ্ডল হাতে ছবিটি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। এতো তারই দেশ। তাছাড়া হাজার হাজার বছর ধরে কত মানুষ এখানে এসেছে। এইসব ভাবতে ভাবতে আপনি চমকে উঠবেন। সূর্য্যদেব ক্লান্ত হয়ে পশ্চিমের দিকে ঢলে পড়ছে আর তার কিরণ স্তিমিত হয়ে আসছে। পাখীরা বুঝতে পেরে তাদের কুলায় ফিরে যাচ্ছে । আপনিও তখন ঘরে ফেরার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।

আবার শুরু হবে একই সূত্রে বাঁধা দৈনন্দিন ক্লান্তিকর জীবন যাত্রা। নিবিড় ভাবে জড়িয়ে পড়বেন, পিষ্ট হবেন সংসারের যাঁতাকলে। শুধু স্মৃতি হয়ে থাকবে সংসার থেকে দূরে প্রকৃতির নির্জনতায় কিছুক্ষন মন-প্রাণ দিয়া অনুভব করে যা আপনি মনের গহনে অমূল্য করে রেখেছেন স্মৃতির ছদ্মবেশে। এই সংসারের মধ্যে মাঝে মাঝেই আপনাকে একটু বৈচিত্র্যের স্বাদ দেবে যদি আপনি চেতনাকে জাগ্রত করেন। উদাস হয়ে যাবেন কিছুটা সময় এই অভিজ্ঞতার স্মৃতিচারণে। এক ধরণের বিষন্ন ভালোলাগা - সেই সঙ্গে থাকবে কষ্ট - এই তো জীবন।

# <u>Audio visual page:</u> ...শিপ্রা অধিকারী

## কিসের লাইগে গরব করিস

লেখনী: মোহিনীমোহন গঙ্গোপাধ্যায়

https://drive.google.com/file/d/1_R4TKrfnVe0ZqOlr2VVRWlutNRwVgy90/view?usp=sharing

## Meet the editors :

Aritra Dutta

Debarghya Chakraborty

Ipsita Sardar

Sohan Ghosh

Sayak Chakraborty

Rajarshi Chakraborty

With association:

All copyrights reserved under:
Amader Swadhin Kolom ©
Price: 30/- only